ঈদ সংখ্যা ২০২২

বজ্রশক্তি সংকলন

রেজি: ডিএ ৬২৬৯, সংখ্যা-০৫
জুলাই ২০২২ | আষাঢ় ১৪২৯ | জিলকদ ১৪৪৩
৩২ পৃষ্ঠা ৫০ টাকা

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

মুদ্রাস্ফীতি

যুদ্ধ

অর্থ পাচার

খাদ্য সঙ্কট

দ্রব্যমূল্য

চলমান সঙ্কট মোকাবেলায় হেযবুত তওহীদের প্রস্তাবনা

দুর্নীতি

সহিংসতা

গুজব

অপরাজনীতি

ধর্মব্যবসা

সম্পাদকীয়

সূচিপত্র

- *চলমান সংকট মোকাবেলায় হেযবুত তওহীদের প্রস্তাবনা* ২
- *তারা এর বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য গ্রহণ করে* ৭
- *সোনালি দিন, চোরগুলি কোথায় থাকবে?* ৯
- *ধর্মের রাজনীতি, তেল ব্যবসায়ী ও আমাদের শিক্ষা* . . .১২
- *মোহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর কোরবানি* ১৪
- *আমার কোরবানি* ১৭
- *আমরা কি সত্যিই আল্লাহর এবাদত করছি?* ২০
- *পদ্মা সেতু উদ্বোধন, বাঙালির দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণ* ২২
- *সন্তানের বয়ঃসন্ধিকালে মা-বাবার ভূমিকা* ২৫
- *সাম্প্রতিক ইতিহাসের ভয়াবহ বন্যা* ২৮

প্রকাশক ও সম্পাদক:
এস এম সামসুল হুদা
১৩৯/১, তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ কর্তৃক মানিকগঞ্জ প্রেস, ৪৪ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উপদেষ্টামণ্ডলী:
মসীহ উর রহমান
উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী
রুফায়দাহ পন্নী

প্রচ্ছদ ও লেআউট কম্পোজিশন:
হেলাল উদ্দিন ও তাসফিক আহম্মেদ

বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়:
২২৩, মধ্য বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪
০২-৪৭২১৮১১১, ০১৭৭৮-২৭৬৭৯৪

বিজ্ঞাপন বিভাগ:
০১৬৩৪-২০৮০৩৯

ওয়েব:
www.bajroshakti.com
facebook.com/dailybajroshakti

ই-মেইল:
bajroshakti@gmail.com

এবারের সংকলনে যা থাকছে

ত্যাগের শিক্ষা আমাদের সংকট নিরসনের সহায়তা করবে চলমান সংকটগুলো যখন ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলছিল তখন তার উপরে শুরু হলো বন্যা সংকট। বন্যায় আক্রান্ত হলো সিলেট ও সুনামগঞ্জ এবং পরবর্তীতে উত্তরাঞ্চলসহ বিভিন্ন অঞ্চলের আরো ১৭টি জেলায় বন্যা বিস্তৃত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে মোকাবেলায় তাই নিতে হয়েছে সুষ্ঠু পদক্ষেপ। এগিয়ে এসেছেন মানবতার কল্যাণে নিবেদিত বহু ব্যক্তি। জুলাইয়ের শুরুতেই আসছে কোরবানি। মুসলমানদের বৃহত্তম দুটি ধর্মীয় উৎসবের অন্যতম। তাই ত্যাগের প্রেরণা উজ্জীবিত হওয়ার সুযোগও সামনে রয়েছে। তাই ত্যাগের শিক্ষা আমাদের বর্তমান সংকটসমূহ নিরসনে সহায়তা করবে বলে আমরা আশাবাদি। কোরবানি শব্দটি এসেছে আরবি 'কুরবুন' শব্দ থেকে, যার অর্থ নিকটবর্তী হওয়া, কাছে যাওয়া, সান্নিধ্য অর্জন করা, নৈকট্য লাভ করা, উৎসর্গ করা, বিশেষ ঘনিষ্ঠ হওয়া, খুব প্রিয় হওয়া, ভালবাসার পাত্র হওয়া ইত্যাদি। অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় কোনো ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই হচ্ছে কোরবানি। তাই বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যা কিছু ত্যাগ করবে সে সবকিছুই কোরবানি অন্তর্ভূক্ত। দুর্নীতি, গুজব, অপরাজনীতি, মাদক, খাদ্যসংকট, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, অর্থ পাচার, মুদ্রাস্ফীতি, যুদ্ধ ও সহিংসতায় যখন আমাদের সমগ্র বিশ্ব আজ জর্জরীতি সেখানে আমাদের কোরবানী শুধু পশু জবাইয়ের মধ্যে সীমবদ্ধ। শুধুমাত্র পশু কোরবানি করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখন সমাজকে শুদ্ধ করা। সামাজিক যে সংকটগুলো আজ আমাদের সামনে প্রকট আকার ধারণ করছে সেগুলো যদি এখনই নিয়ন্ত্রণে না আনা যায় তবে তা আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র এমনিক সভ্যতাকেও গ্রাস করবে। বর্তমান পৃথিবীর অবস্থা হচ্ছে, আজ পৃথিবীর কোথাও শান্তি নেই। করোনাকালীন সময়ে শুধু আমাদের দেশের দিকে তাকালে দেখা যায় আমাদের চরম দুর্দশার চিত্র। আজ দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচারে, দরিদ্রের ওপর ধনীর বঞ্চনায়, শোষণে, শাসিতের ওপর শাসকের অবিচারে, ন্যায়ের ওপর অন্যায়ের বিজয়ে, সরলের ওপর ধূর্তের বঞ্চনায়, পৃথিবী মানুষের বাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। সমাজে চলছে অন্যায়, প্রতিটি ব্যবস্থায় ঢুকেছে দুর্নীতি, সুদ-ঘুষ এগুলো তো নিত্যদিনের ব্যাপার। বনের পশুকে কোরবানি সবাই করছে কিন্তু মনের পশুকে কোরবানি দিতে পারছে কয়জন? তাই ত্যাগের যে শিক্ষা আমরা কোরবানির ঈদের মাধ্যমে অর্জন করব সে ত্যাগের শিক্ষাকে সামাজিক ও বাস্তব জীবনেও ব্যবহার করতে হবে। এখন থেকেই আমাদের প্রত্যেকের সংকল্প হবে আসন্ন ও চলমান সকল সংকট থেকে মোকাবেলা করার জন্য নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে বাদ দিয়ে জাতিগত স্বার্থের কথা চিন্তা করা। মনে রাখতে হবে, আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া আমাদের সংকটগুলোর সমাধান হওয়া অসম্ভব। এছাড়াও বাস্তব সংকটের বাস্তব সমাধের পথ আমাদের কাছে রয়েছে। তাই এখনই সময় ত্যাগের শিক্ষায় ভাস্বর হয়ে দেশ, সমাজ ও সভ্যতা গঠনে নিজেদের আত্মনিয়োগ প্রদান করা।

চলমান সংকট মোকাবেলায় হেযবুত তওহীদের প্রস্তাবনা

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

বিশ্বপরিস্থিতি বর্তমানে ভীষণ টালমাটাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সাম্রাজ্যবাদী অস্ত্রব্যবসায়ী পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলো একের পর এক যুদ্ধ সংঘটিত করে বিশ্বকে অস্থিতিশীল করে রেখেছে। দেশে দেশে সংঘাত সংঘর্ষ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। বিশেষ করে মুসলিম প্রধান দেশগুলিকে পদানত ও শোষণ করার জন্য নানা অসিলায় অন্যায়ভাবে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তান, লিবিয়া, ফিলিস্তিন, বসনিয়া, চেচনিয়া ইত্যাদি দেশগুলোকে একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। বর্তমানে রাশিয়া কর্তৃক ইউক্রেন আক্রমণের মধ্য দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী এক যুদ্ধের সূচনা হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ, ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা সচিব বেন ওয়ালেস সকলেই বলছেন যে, বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক জোট ন্যাটোর সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধই হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা।

আমরা মনে করি, কোনো সংকট আসলে জাতিকে সম্মিলিতভাবে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয়। হেযবুত তওহীদ এ পর্যন্ত এ প্রস্তাবটিই দিয়ে আসছে। সমস্ত অশান্তির মূল হলো অনৈক্য। ঐক্যবদ্ধ হতে চাইলে এখনও হওয়া সম্ভব। বিশেষ করে এ দেশের ১৫ কোটি মানুষ মুসলমান। আমরা আল্লাহ, রসুল, কোর'আন বিশ্বাস করি, আমরা বিশ্বাস করি, ইসলাম এমন একটি উত্তম জীবনব্যবস্থা যার দ্বারা মানবজীবনের সকল সংকটের সমাধান করা সম্ভব। ইসলামপূর্ব জাহেলি সমাজেও এধরনের নানা সংকট ও সংঘাত ছিল যেগুলো সমাধান রসুলাল্লাহ করেছিলেন ইসলাম দিয়েই। কিন্তু বিগত ১৪০০ বছরে সেই ইসলাম বিকৃত ও বিপরীতমুখী হয়ে যাওয়ার দরুন শান্তি আসছে না।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে অবধারিত বিষয় হচ্ছে এতে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করা হবে যা ভয়াবহ অমানবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। বিশেষজ্ঞদের মতে পরমাণু অস্ত্রের প্রয়োগ হলে মানবজাতিও বিনাশ হয়ে

যেতে পারে। বিভিন্ন জরিপ মতে, বর্তমানে প্রায় ১৬ হাজারেরও বেশি পারমাণবিক অস্ত্র পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে রয়েছে। পৃথিবীর মোট ১৯৬টি দেশের মধ্যে মাত্র ৯টির এখতিয়ারে পারমাণবিক অস্ত্রসমূহ রয়েছে।

পৃথিবীতে অবস্থিত এ সকল পারমাণবিক হাতিয়ারের শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি দুই পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মালিকানাধীন। 'আর্থস ফিউচার' নামক বৈজ্ঞানিক গবেষণা সাময়িকীতে প্রকাশিত ২০১৪ সালের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, মাত্র ১০০টি পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণই পৃথিবীতে ২৫ বছরের জন্য সূর্যালোকের আগমন বন্ধ করে দেবে। যার ফলে পৃথিবী মানুষের বাসযোগ্যতা হারাবে এবং পরিণামে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে মানবজাতি। যেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত পারমাণবিক বোমা লিটল বয় একটি শহর ধ্বংসের পাশাপাশি ৭০,০০০ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল, সেখানে রাশিয়ার হাতে থাকা 'জার বম্বা' যদি নিউইয়র্কে ফেলা হয়, তাহলে তা ৭৬ লক্ষ মানুষ নিধনের পাশাপাশি আরো ৪০ লক্ষ মানুষকে আহত করবে। এর থেকে সৃষ্ট পারমাণবিক তেজষ্ক্রিয় ধূলিকণা ঘণ্টায় ১৫ মাইল বেগে বহমান বাতাসে প্রায়

৭,৮৮০ কিলোমিটার এলাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রাণ হারাতে হবে।

ইউক্রেনের এই যুদ্ধের ফলে সমগ্র পৃথিবীর অর্থনীতিতে ইতোমধ্যেই বিরাট নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। হুহু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়ছে। টাকার বিপরীতে ডলারের দাম বেড়েছে রেকর্ড পরিমাণ। বৈদেশিক ঋণের বোঝা দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাঁধে বর্তায়। এই ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে বৃদ্ধি করা হয় দ্রব্যমূল্য। এই ঋণের যাঁতাকলে পড়ে ইতোমধ্যেই শ্রীলঙ্কায় সৃষ্টি হয়েছে ভয়াবহ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট। এক কাপ চায়ের মূল্য দাঁড়িয়েছে ১০০ টাকা, এক কেজি চালের মূল্য দাঁড়িয়েছে ৫০০ টাকা। পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে জনগণের বিক্ষোভের মুখে সরকারের পতন ঘটেছে। প্রভাবশালী এমপি, মন্ত্রীদের গণপিটুনির শিকার হতে হয়েছে ন্যাক্করজনকভাবে।

১৯৭১ সনে লাখো দেশপ্রেমী জনতার জীবনের বিনিময়ে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। আমরা চেয়েছিলাম সুখী, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ একটি দেশ ও জাতি গড়ে তুলতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার শেখানো রাজনৈতিক দলবাজি প্রবলভাবে বিস্তার লাভ করে। ছাত্রদেরকেও দলীয় সন্ত্রাসী ক্যাডারে পরিণত করা হয়। পাশাপাশি ধর্মের নামে অপরাজনীতি, সাম্প্রদায়িক ঘৃণাবিস্তার ও দাঙ্গা, অন্ধত্বের কুশিক্ষার প্রসার, ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি জাতিকে গ্রাস করে নেয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন ও সামাজিক অঙ্গন হয়ে ওঠে দুর্যোগপূর্ণ, অস্থিতিশীল। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি প্রবেশ করে জাতির অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডকে গুড়িয়ে দিয়েছে, দেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি হিসাবে পরিচিত করেছে। দেশের পরিশ্রমী তরুণ প্রজন্ম বিদেশে গিয়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করছে, তাদের আরো বড় একটি অংশ পোশাক শিল্পে অমানবিক শ্রম দিচ্ছে। কিন্তু তাদের সেই অর্থ শোষণ করা হচ্ছে। তথাপি এই দুটো খাত বাদ দিলে আমাদের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে এমন বড় কোনো খাত আর নেই। এরই মধ্যে দুই বছর ধরে চলা করোনা মহামারির কারণে সমগ্র বিশ্বের অর্থনীতিতে মন্দা নেমে এসেছে। দরিদ্র দেশগুলোর অর্থনীতি একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়েছে।

আন্তর্জাতিক যুদ্ধ পরিস্থিতি, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ধস, করোনা মহামারির ফলে কর্মহীনতা, বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক অঙ্গন, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ইত্যাদি সব মিলিয়ে আমাদের এই দেশ এমন এক ভয়াবহ সংকটের মুখে পড়েছে যে পরিণতি চিন্তা করে সকল শ্রেণির মানুষের কপালেই ভাঁজ পড়েছে। সরকার যেমন উদ্বিগ্ন, প্রতিদিন প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনী দ্রব্য চাল, ডাল, আটা, তেল, মাছ, মাংস, শাক-সবজি সব কিছুর দাম সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ আজ দিশেহারা। কীভাবে কাটবে জীবন, সন্তানদের মুখে দুটো ভাত তুলে দিতে পারব তো? সংকটকালে শিয়াল-কুকুর, সাপ বেজিও একসাথে বাস করে। আমরা কি পারব এই বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে এতদিনকার যাবতীয় দ্বন্দ্ব-বিরোধ আপাতত একপাশে সরিয়ে রেখে ঐক্যবদ্ধ হতে? নাকি সংকটকালে আমরা আরো স্বার্থপরতায় আক্রান্ত হয়ে পূর্ব থেকে চলে আসা রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নিয়ে মারামারি, খুনোখুনি, রক্তারক্তির দিকে হাঁটব?

আমরা মনে করি, কোনো সংকট আসলে জাতিকে সম্মিলিতভাবে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয়। হেযবুত তওহীদ এ পর্যন্ত এ প্রস্তাবটিই দিয়ে আসছে। সমস্ত অশান্তির মূল হলো অনৈক্য। ঐক্যবদ্ধ হতে চাইলে এখনও হওয়া সম্ভব। বিশেষ করে এ দেশের ১৫ কোটি মানুষ মুসলমান। আমরা আল্লাহ, রসুল, কোর'আন বিশ্বাস করি, আমরা বিশ্বাস করি ইসলাম এমন একটি উত্তম জীবনব্যবস্থা যার দ্বারা মানবজীবনের সকল সংকটের সমাধান করা সম্ভব। ইসলামপূর্ব জাহেলি সমাজেও এধরনের নানা সংকট ও সংঘাত ছিল যেগুলো সমাধান রসুলাল্লাহ করেছিলেন ইসলাম দিয়েই। কিন্তু বিগত ১৪০০ বছরে সেই ইসলাম বিকৃত ও বিপরীতমুখী হয়ে যাওয়ার দরুন শান্তি আসছে না। আমরা হেযবুত তওহীদ আবারও সেই হারিয়ে যাওয়া অবিকৃত ইসলামকে তার অনাবিলরূপে উদ্ধার করে মানবজাতির সামনে উপস্থাপন করছি। এ চলমান বৈশ্বিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সংকট, ধর্মীয় উগ্রপন্থা, গুজব-সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মোকাবেলায় হেযবুত তওহীদের স্পষ্ট প্রস্তাবনা নিম্নরূপ:

প্রথম প্রস্তাবঃ পুরো জাতিকে এখন ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। বর্তমান এই সংকট মোকাবেলা করতে হলে পুরো জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। আমরা ভুল রাজনীতির চর্চা করি, যাতে জাতির ঐক্য ধ্বংস করার সকল আয়োজন সুসম্পন্ন করা হয়েছে। সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী বহু নীতির দল রয়েছে। আবার ইসলামপন্থী দলও রয়েছে শত শত। দেশজুড়ে ছড়িয়ে আছে হাজার হাজার পীর। তাদের সবার আছে ভিন্ন ভিন্ন তরিকা। তাদের অনুসারী বেড়ে গেলে অনেকেই রাজনীতির মাঠে চলে আসেন। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, এত ধরনের এত পুরোনো সব অনৈক্যের দেওয়াল কীভাবে চুরমার করা যাবে? আদৌ কি এটা সম্ভব? কে করবে এই কাজ? কোন সূত্র দিয়ে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করবে?

ঠিক এই সমস্যাটাই ১৪০০ বছর আগের আরবীয় জাহেলি সমাজে ছিল। আরব উপদ্বীপে বসবাসকারী গোত্রগুলোর মধ্যে এমন অনৈক্য ও বিবাদ ছিল যে কেউ বিশ্বাস করত না যে এরকম সংঘর্ষ, দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত গোত্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে। কিন্তু সেই অবিশ্বাস্য ঘটনাটাই ঘটল। ইতিহাসের এক বিস্ময়কর ঘটনা ছিল আরবদের সেই পরিবর্তন যা ঘটিয়েছিলেন নবী করিম (দ.)। তিনি ঠিকই শতধাবিচ্ছিন্ন আরব গোত্রগুলোকে সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ঘোষণাকেই ইসলামের পরিভাষায় বলা হয় তওহীদ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুমদাতা নেই। কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায় তার চূড়ান্ত মানদণ্ড হিসাবে আল্লাহর বিধানকে মেনে নেওয়াই হচ্ছে ঐক্যের একমাত্র সূত্র। আমাদের দেশের সকল হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রিষ্টান, আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি সকলকে যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। স্বার্থচিন্তার কারণে দেশকে ধ্বংস হতে দেওয়া যাবে না। দেশ ধ্বংস হলে কেউই রক্ষা পাবে না।

পরবর্তী প্রশ্ন হবে - ঐক্যবদ্ধ করবেন কে, কার কথায় মানুষ বিশ্বাস স্থাপন করবে? বিশ্বাস স্থাপন করার মত অবস্থা নাই। প্রত্যেকের দোষ খুঁজে খুঁজে বের করা হচ্ছে। এভাবে দোষ বিচার করতে বসলে কাউকেই নির্দোষ পাওয়া যাবে না। তাই কাউকে না কাউকে বিশ্বাস করতে হবে কেবল জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে। তবে হেযবুত তওহীদ এই ঐক্য গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে উদ্যোগ নিচ্ছে। হেযবুত তওহীদ গত ২৭ বছর ধরে এই ঐক্যের ডাক দিয়ে যাচ্ছে এবং ঐক্য ভঙ্গের কোনো কাজ হেযবুত তওহীদ করেনি। এই দীর্ঘ সময়ে হেযবুত তওহীদ দেশের কোনো আইন ভঙ্গ করে নি। হেযবুত তওহীদের কোনো কর্মী বিদেশে টাকা পাচার করেছে এমন প্রমাণও কেউ দেখাতে পারবে না। আমাদের যে সমস্ত সদস্যরা প্রবাসে কাজ করেন তারা বরং বাংলাদেশে টাকা পাঠিয়েছেন। আমরা সকল সদস্যের প্রদত্ত অর্থে বহু ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হাতে নিয়েছি এবং জাতির কল্যাণে সামান্য হলেও ভূমিকা রাখছি। কাজেই হেযবুত তওহীদ ঐক্য নষ্টকারী কোনো কাজ করবে না, ছোটখাট বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না, সঙ্কীর্ণতার মধ্যে যাবে না - এটা অতীতেও প্রমাণিত হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে ইনশাল্লাহ।

এই সংকটের সুযোগ নিয়ে অনেকে চেষ্টা করবে লুটতরাজ করতে, পণ্য মজুদ করে, নানা উপায়ে স্বার্থ হাসিল করতে। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকারীরা হয়ত চেষ্টা করবে বাংলাদেশকে শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য। কিন্তু বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষের দায়িত্ব আছে দেশটাকে রক্ষা করার জন্য। এ জাতীয় জাতিবিনাশী কর্মকাণ্ড ঘটার আগেই এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাবঃ দেশের একটা টাকাও বিদেশে পাচার করতে দেয়া যাবে না। শুধু বিদেশ থেকে কোনো প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমদানি করা যাবে। একটি বিলাসদ্রব্যও আমদানি করা যাবে না।

তৃতীয় প্রস্তাবঃ ভোগবাদি জীবনযাবন থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি বলেছেন খরচ কমানোর জন্য। আসলে বিষয়টা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। মানুষ এমনভাবে ভোগবাদী ও বস্তুবাদী হয়েছে, যে মানুষ আগে দশ হাজার টাকা দিয়ে চলতে পারত, তার আজকে বিশ হাজার টাকা লাগে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে সত্য, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতায়, যুগের হাওয়ায় গা ভাসিয়ে মানুষ অনেক বেশি অপচয়

করছে এটা তার চেয়ে বড় সত্য। একেকটা সামাজিক অনুষ্ঠানে মানুষ ব্যাপক খরচ করে। কেবল লোক দেখানোর জন্য ব্যয়বহুল রেস্টুরেন্টে খেয়ে মধ্যবিত্ত মানুষ এখন হাজার হাজার টাকা নষ্ট করে। মোহনীয় বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পড়ে নতুন নতুন মডেলের ফোন ব্যবহার করার নেশা তাদেরকে পেয়ে বসেছে। গরীবের সংসারে বড়লোকি চলে না। বাংলাদেশে কিছু উঠতি উচ্চবিত্ত থাকলেও অধিকাংশ মানুষ এখনও দরিদ্রসীমার নিচে বাস করে, এ বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে এ জাতীয় অহেতুক ব্যয়গুলো কমাতে হবে।

ধর্মকে ব্যবহার করে ব্যবসা, অপরাজনীতি, কায়েমি স্বার্থ উদ্ধার করা, সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়া, গুজব-হুজুগ সৃষ্টি করা বন্ধ করতে হবে। যেহেতু এই দেশের প্রায় ৯০% জনসংখ্যা মুসলমান, তাদের ধর্মানুভূতিকে ব্যবহার করে, ঈমানকে হাইজ্যাক করে বারবার এদেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটানো হয়েছে।

আমাদের দেশে পাশ্চাত্য জীবনব্যবস্থার উপজাত হিসাবে একটি অভিজাত, ধনপতি আমলা, উচ্চবিত্ত রাজনৈতিক নেতা শ্রেণি সৃষ্টি হয়ে গেছে, যারা তাদের হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশের ব্যাংকে জমা করেছে, কানাডা মালয়েশিয়ায় সেকেন্ড হোম করেছে, বিয়ে শাদির বাজার করতে তাদের ব্যাংকক দুবাই না গেলে চলছে না, সর্দিকাশি হলেও তারা চলে যাচ্ছে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথে কিংবা পুনেতে। এইভাবে টাকা চলে যাচ্ছে দেশের বাইরে, তা দিয়ে লাভবান হচ্ছে অন্যরা। দেশকে রক্ষা করতে হলে আমাদেরকে চিকিৎসা, শিক্ষা, বিনোদন, কেনাকাটা ইত্যাদি খাতে বিদেশে খরচ করার প্রবণতা একদম বন্ধ করতে হবে।

চতুর্থ প্রস্তাবঃ এলিট (অভিজাত) শ্রেণিকে সাধারণ মানের জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। ব্রিটিশদের অনুকরণে ব্রিটিশ লর্ডরা যে মানের জীবনযাপন করতেন আমাদের অনেক আমলা, আইনপ্রণেতাও (এমপি) সেই মানের জীবনযাপন করেন। কিন্তু আমাদের মত দরিদ্র দেশের এলিট শ্রেণিকে এটা করা সাজে না। কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে, ব্রিটিশ তথা পশ্চিমা সভ্যতা আর আমাদের ইতিহাস ভিন্ন। এক সময় আমরা ধনেজনে সমৃদ্ধ ছিলাম। সেই ধনরাশি দেখে লোভাতুর ইউরোপীয় জাতিগুলো আমাদেরকে ছলে বলে কৌশলে পদানত করেছে। তারপর দীর্ঘ দুইশ বছর শোষণ করে সম্পদশালী একটা উপমহাদেশকে প্রায় ফকির বানিয়ে, ৪/৫ টা মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ দেখিয়ে, কোটি কোটি মানুষের প্রাণহানী করে, মগজে সাদারাই সেরা (White Supremacy) এই বিশ্বাস এবং আত্মদৈন্যের গানি ও হীনম্মন্যতা ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। এই উপমহাদেশ থেকে চুরি করা সম্পদের পাহাড়ে বসে তাদের রাজারানী, মন্ত্রী, লর্ড, সিনেটরদের যে বিলাসিতা সাজে, আমাদের তা সাজে না। আমাদের অত টাকা নেই যা দিয়ে আমাদের নেতাদেরকে আমরা সেইভাবে রাখতে পারি। আমাদের নেতারা সেটা না বুঝে দরিদ্র প্রজাদের উপর দিন দিন আরো ঋণের বোঝা করের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। উপনিবেশযুগের মতই শোষণ করছে নিজ স্বাধীন দেশের মানুষকে।

কৃষক শ্রমিক জনতার কষ্টের টাকায় এ দেশ চলে। এদেশের কোটি কোটি তরুণ তরুণী জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে বছরের পর বছর বিদেশে পড়ে আছে। ওদের টাকায় এ দেশ চলে। পোশাক শিল্প কারখানায় চাকরি করে লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষ তিলে তিলে তাদের জীবন শেষ করে দিচ্ছে। সেই গার্মেন্টেস শ্রমিকদের আয় দিয়েই এ দেশ চলে। তাই আমাদের এলিট শ্রেণির এই জঘন্য বিলাসিতা মানায় না। দেশকে রক্ষা করতে হলে অতি সত্বর এই আত্মপ্রচঞ্চনা থেকে তাদের বেরিয়ে আসতে হবে। ন্যূনতম সাধারণ মানের জীবনযাপনে তাদেরকে অভ্যস্ত হতে হবে।

পঞ্চম প্রস্তাবঃ দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

ষষ্ঠ প্রস্তাবঃ ধর্মকে ব্যবহার করে ব্যবসা, অপরাজনীতি, কায়েমি স্বার্থ উদ্ধার করা, সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়া, গুজব-হুজুগ সৃষ্টি করা বন্ধ করতে হবে। যেহেতু এই দেশের প্রায় ৯০% জনসংখ্যা মুসলমান, তাদের ধর্মানুভূতিকে ব্যবহার করে, ঈমানকে হাইজ্যাক করে বারবার এদেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটানো হয়েছে। কেউ তাদের ঈমানকে ব্যবহার করে রাজনীতি করেছে, কেউ জঙ্গিবাদের বিস্তার ঘটিয়েছে, কেউ কাড়ি কাড়ি টাকা কামিয়েছে। ধর্মকে আশ্রয় করে তাদের এই রোজগারের পরিমাণ এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে, সরকার একে আয়করের আওতায় আনারও পরিকল্পনা নিয়েছে। তারা ওয়াজের মঞ্চে বসে তাদের প্রতিপক্ষকে বেআইনী হুমকি দিচ্ছে, প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে, হুজুগ গুজব ছড়িয়ে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করছে। এগুলো বন্ধ করার উপায় একটাই, ইসলামের প্রকৃত ব্যাখ্যা আল্লাহ রসুলের ইসলামের প্রকৃত রূপ জনসম্মুখে তুলে ধরতে হবে। তাহলেই মানুষ পরিষ্কার বুঝতে পারবে ইসলামের উদ্দেশ্য কী, রসুল (সা.) কেন এসেছেন, কোনটা হক কোনটা বাতিল, কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা, কোনটা

আল্লাহর হুকুম আর কোনটা ধর্মব্যবাসয়ীদের বানানো শরিয়াহ, কোনটা রাসুলুল্লাহর নির্দেশ আর কোনটা মিথ্যা ফতোয়া। এটা যখন জনগণের সামনে পরিষ্কার হবে তখন আর কেউ তাদের ঈমানকে হাইজ্যাক করতে পারবে না। ইসলামের প্রকৃত রূপ, প্রকৃত ইতিহাস ও আদর্শ জাতির সামনে তুলে ধরে জনসচেতনতা সৃষ্টির কাজটি আমরা করছি। এ লক্ষ্যে আমরা দেশজুড়ে লক্ষ লক্ষ পথসভা, জনসভা, সেমিনার, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠান করেছি, পত্রিকা প্রকাশ, বই-হ্যান্ডবিল প্রচার, অনলাইন মাধ্যমসহ যতভাবে সম্ভব প্রচারাভিযান চালিয়ে যাচ্ছি।

আমরা বলেছি প্রয়োজনে বাংলাদেশের মাটিতে জীবন দেব, তবু দেশ ছেড়ে পালাব না, বাংলাদেশকে ইরাক সিরিয়া আফগানিস্তান হতে দেব না ইনশাল্লাহ। এই ভূমি সত্যের ভূমি। রসুলাল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবিরা রক্ত দিয়ে, খেয়ে না খেয়ে, পেটে পাথর বেঁধে, গাছের লতাপাতা খেয়ে মদিনাকে রক্ষা করেছেন। কারণ মদিনা ছিল সত্যের ভূমি। ঠিক তেমনি বাংলার মাটিতে আমরা সেজদা করি, এই মাটিতে আমাদের পূর্বপুরুষের অস্থি মজ্জা মিশে আছে, এ দেশের আলো বাতাসে আমরা বেড়ে উঠেছি। এই মাটিতে আমাদের ভবিষ্যৎ। তাই এ দেশকে আমরা ধ্বংস হতে দিতে পারি না।

এই সংকটের সুযোগ নিয়ে অনেকে চেষ্টা করবে লুটতরাজ করতে, পণ্য মজুদ করে, নানা উপায়ে স্বার্থ হাসিল করতে। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকারীরা হয়ত চেষ্টা করবে বাংলাদেশকে শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য। কিন্তু বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষের দায়িত্ব আছে দেশটাকে রক্ষা করার জন্য। এ জাতীয় জাতিবিনাশী কর্মকাণ্ড ঘটার আগেই এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

পরিশেষ বলতে চাই, এই ভয়াবহ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় উগ্রবাদের সংকটগুলি দূর করানোর জন্য আর পারস্পরিক দোষাদোষি নয়, হানাহানি নয়, দাঙ্গা নয়, বিক্ষোভের নামে জ্বালাও পোড়াও নয়, এগুলো করলে আমাদেরই ক্ষতি হবে। আমরা আবারও পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে যাব। এই সংকটকালে ভয় পেয়ে কেউ কেউ হয়ত দেশ ছেড়ে পালাবে, কেউ আবার সুযোগ বুঝে দেশে ঢুকবে। কিন্তু আমাদের দেশের জনগনের মুক্তি হবে না। সেই মুক্তির জন্য আসলে কী করণীয় সেই রূপরেখা হেযবুত তওহীদ তুলে ধরছে। আমরা দেশকে রক্ষার প্রস্তাব নিয়ে ময়দানে আছি। আমরা সবসময় জাতির কল্যাণে কথা বলেছি। আমরা বলেছি প্রয়োজনে বাংলাদেশের মাটিতে জীবন দেব, তবু দেশ ছেড়ে পালাব না, বাংলাদেশকে ইরাক সিরিয়া আফগানিস্তান হতে দেব না ইনশাল্লাহ। এই ভূমি সত্যের ভূমি। রসুলাল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবিরা রক্ত দিয়ে, খেয়ে না খেয়ে, পেটে পাথর বেঁধে, গাছের লতাপাতা খেয়ে মদিনাকে রক্ষা করেছেন, কারণ মদিনা ছিল সত্যের ভূমি। ঠিক তেমনি বাংলার মাটিতে আমরা সেজদা করি, এই মাটিতে আমাদের পূর্বপুরুষের অস্থি মজ্জা মিশে আছে, এ দেশের আলো বাতাসে আমরা বেড়ে উঠেছি। এই মাটিতে আমাদের ভবিষ্যৎ। তাই এ দেশকে আমরা ধ্বংস হতে দিতে পারি না। এখান থেকে আমরা যদি উদ্বাস্তু হই, তাহলে আমাদের কোথাও দাঁড়ানোর জায়গা থাকবে না। তাই আমরা বাংলাদেশকে ধ্বংস হতে দেব না। এই অঙ্গীকার আমরা হেযবুত তওহীদ করেছি। আমরা আপনাদেরকেও আহ্বান করছি, আসুন একটা কথার উপর ঐক্যবদ্ধ হই, দল-মত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আমরা যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে পুরো জাতি ইস্পাত কঠিন ঐক্য গড়ে তুলি।

যদি ঐক্যবদ্ধ হতে পারি, ইনশা'আল্লাহ হলফ করে বলতে পারি, এই সংকট আমরা মোকাবেলা করতে পারব। আমাদের কাউকে না খেয়ে মরতে হবে না, বিনা চিকিৎসায় মরতে হবে না, কেউ বস্ত্রের অভাবে কষ্ট পাবে না, শিক্ষা থেকে কেউ বঞ্চিত হবে না। এতটুকু নিশ্চয়তা আমরা দিতে পারি। ঐক্যবদ্ধ জাতিসত্ত্বা গড়ে তুলতে পারলে সাম্রাজ্যবাদী অস্ত্রব্যবসায়ী পরাশক্তিধর সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রগুলোর লোলুপদৃষ্টি থেকে আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমি নিরাপদ থাকবে। আল্লাহও তখন আমাদেরকে সাহায্য করবেন। সময় বেশি বাকি নেই, তাড়াতাড়ি হেযবুত তওহীদের আহ্বানে সাড়া দিন। আল্লাহ আমাদেরকে সামগ্রিক পরিস্থিতি উপলব্ধি করার এবং সত্যের পথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তওফিক দান করুন।

লেখক: এমাম, হেযবুত তওহীদ
ফোন: ০১৬৭০১৭৪৬৫১,
০১৭১১৫৭১৫৮১, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩
ওয়েবসাইট: hezbuttawheed.org
ইমেইল: hezbuttawheed1995@gmail.com

তারা এর বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য গ্রহণ করে

রিয়াদুল হাসান

দীনের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করা হারাম, নিষিদ্ধ। কোর'আনে এ প্রসঙ্গে সামানান কালিলা অর্থাৎ তুচ্ছ মূল্য শব্দটি বারবার এসেছে। ইসলামের শরিয়তের প্রধান উৎস হচ্ছেকোর'আন। যে বিষয়ে কোর'আনে কোনো সুস্পষ্ট ফায়সালা আছে সে বিষয়ে কোনো ভিন্নমতের সুযোগ থাকে না। কেউ তা অস্বীকার করলে ইসলামের পরিভাষায় তাকে কাফের বা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী বলা হয়।

দীনের বিনিময় গ্রহণের প্রসঙ্গটি কোর'আনে বহুবার এসেছে, কারণ ধর্মের ইতিহাসের সঙ্গে ধর্মব্যবসায়ীদের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সব যুগেই ধর্মকে ব্যবহার করে স্বার্থসিদ্ধিকারী বহু রকমের ধর্মব্যবসায়ীর আবির্ভাব সব সমাজে ঘটেছে। এরাই নবী-রসুলদের সত্য প্রচারের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। তাই নবী-রসুলগণও এদের মুখোস খুলে দিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। অনেক নবী রসুল এদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণও করেছেন।

> ***নূহ (আ.) এর ঘোষণাঃ আমি এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো কেবল বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে (সুরা শু'আরা ১০৯)***

অধিকাংশ আলেম-ওলামা, পুরোহিত, পীর-ফকির, সাধু-সন্ন্যাসী, মন্দিরের সেবায়েত, গির্জার ফাদার, প্যাস্টর, সিনাগগের রাব্বাই, সাদ্দুসাই, ফরিশিরা যেহেতু মানুষকে সৎপথে আহ্বান করা, সদুপদেশ দেওয়া এবং ধর্মকর্মের আনুষ্ঠানিক কাজগুলো করে দেওয়ার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন। জীবিকার স্বার্থে তারা জোর দেন সেই কাজগুলোর উপর যেগুলোতে তাদের পকেটে দুই পয়সা বেশি আসে। এর দরুন ধর্মের চেয়ে আগাছা বেড়ে যায়। ধর্মের সুফল থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়।

নবী-রসুলরা এসে যখন সত্য প্রচার শুরু করেন, তখন এই পুরোহিত-আলেম শ্রেণির কায়েমী স্বার্থে আঘাত লাগে। কেননা নবী-রসুলদেরকে যদি মানুষ আল্লাহর প্রেরিত বলে বিশ্বাস করে তাহলে তাদেরকেই ধর্মের কর্তৃপক্ষ হিসাবে মেনে নিতে হয়, পুরোহিতদের আর কোনো মূল্য থাকে না। যারা অর্থের বিনিময়ে ধর্মের কাজ করে তারা মানুষকে খাঁটি ইসলামটা শেখাবে না, শেখায় না। তাই নবী-রসুলগণ সবাই মানুষকে একটি সতর্কবার্তা অবশ্যই দিয়েছেন- যারা ধর্মের বিনিময়ে সামানান কালিলা (তুচ্ছ পার্থিব মূল্য) গ্রহণ করে মানুষ যেন তাদের অনুসরণ ও আনুগত্য না করে। এ বিষয়ে হাদিস, ইজমা, কিয়াসের প্রয়োজন নেই কেননা আল্লাহ স্বয়ং তাঁর স্বলিখিত গ্রন্থ আল কোর'আনে এই হুকুম বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন। তিনি মানুষকে হুকুম করেছেন, 'তোমরা তাদের অনুসরণ করো যারা কোনো বিনিময় কামনা করে না এবং যারা সঠিক পথে আছে।' (সুরা ইয়াসিন ২১)।

অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর এই সুস্পষ্ট হুকুমটি জানেই না। কারণ যারা ধর্মের শিক্ষক তারা মানুষকে এটা শেখায় না। এটা শেখালে তাদের চাকরি থাকবে না। কিন্তু আল্লাহ মানবজাতির শিক্ষক মহানবী (সা.)-কে শিক্ষা দিচ্ছেন যেন তিনি পূর্ববর্তী সকল নবী-রসুলদের পন্থা অনুসরণ করেন। তিনি বলেন, 'তাদেরকেই (নবীদেরকেই) আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন। সুতরাং তুমিও তাদের পথ অনুসরণ কর; বল! এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না (সুরা আনআম ৯০)'।

> ***শোয়েব (আ.) এর ঘোষণাঃ আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোনো মূল্য চাই না। আমার মজুরি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে (সুরা শু'আরা-১৮০)।***

অন্যান্য নবীরাও ঠিক একইভাবে বলেছেন যে, 'এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময়, মজুরি, পারিশ্রমিক চাই না।' কোর'আনে এ বিষয়টি এত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে পুনরুক্তি হলেও আমাকে সেই আয়াতগুলো উল্লেখ করতে হচ্ছে।

১. নূহ (আ.) এর ঘোষণা: হে আমার সম্প্রদায়! এর পরিবর্তে আমি তোমাদের নিকট ধন সম্পদ চাই না। আমার পারিশ্রমিক আল্লাহর নিকট (সুরা হুদ-২৯)।

২. হুদ (আ.) এর ঘোষণা: হে আমার সম্প্রদায়! আমি এর পরিবর্তে তোমাদের নিকট কোনো মজুরি চাই না। আমার পারিশ্রমিক তাঁরই নিকট যিনি আমাকে সৃষ্টি

করেছেন। তোমরা কি তবুও বুদ্ধি (আক্‌ল) খাটাবে না (সুরা হুদ-৫১)?

৩. নূহ (আ.) এর ঘোষণা: আমি এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো কেবল বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে (সুরা শু'আরা ১০৯)।

৪. সালেহ (আ.) এর ঘোষণা: আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোনো পারিশ্রমিক চাই না। আমার মজুরি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে (সুরা শু'আরা-১৪৫)।

৫. লুত (আ.) এর ঘোষণা: এর জন্য আমি কোনো মজুরি চাই না। আমার মজুরি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে (সুরা শু'আরা-১৬৪)।

৬. নূহ (আ.) এর ঘোষণা: যদি তোমরা আমার কথা না শোনো তাহলে জেনে রাখ, আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাই নি। আমার প্রতিদান কেবল আল্লাহর নিকট এবং আমাকে মুসলিম (সত্যের প্রতি সমর্পিত) হওয়ার জন্য আদেশ করা হয়েছে (সুরা ইউনুস ৭২)।

৭. হুদ (আ.) এর ঘোষণা: আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট কোনো মজুরি চাচ্ছি না। আমার পারিশ্রমিক তাঁরই নিকট যিনি এই বিশ্বজাহানের স্রষ্টা (সুরা শু'আরা ১২৭)।

৮. শোয়েব (আ.) এর ঘোষণা: আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোনো মূল্য চাই না। আমার মজুরি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে (সুরা শু'আরা-১৮০)।

কোর'আনে পূর্ববর্তী নবীদের এই ঘোষণাগুলো উল্লেখ করার কারণ কী? নিশ্চয়ই কোর'আনের অনুসারীদেরকে সতর্ক করা যেন তারা পূর্ববর্তী জনগোষ্ঠীর মত ধর্মব্যবসায় জড়িয়ে না পড়ে, যেন তারা ধর্মব্যবসায়ীদের থেকে ধর্ম শিক্ষা না করে। তাই নয় কি?

কিন্তু এত সতর্কবাণীতেও শেষরক্ষা হয়নি। কারণ যারা ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠী অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে এই আয়াতগুলোতে মানুষের চোখে আড়াল করে রেখেছে। তারা মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে রেখেছে যে বিষয়গুলো পালন করলে তাদের ধর্মব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি হয় সেগুলোর দিকে। ফলে পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠছে নতুন নতুন মসজিদ-মাদ্রাসা। সেগুলোতে দান করার জন্য দিনরাত ওয়াজ করা হচ্ছে। সদকায়ে জারিয়ার ফজিলত বর্ণনা করা হচ্ছে। বাড়ছে ওয়াজ মাহফিল। বাংলাদেশে এমন হাজার হাজার বক্তা আছেন যারা লাখ টাকার নিচে ওয়াজ করেন না, যাদের শিডিউল পেতে অন্তত তিনমাস আগে চুক্তি করতে হয়।

> ***নূহ (আ.) এর ঘোষণা: যদি তোমরা আমার কথা না শোনো তাহলে জেনে রাখ, আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাইনি। আমার প্রতিদান কেবল আল্লাহর নিকট এবং আমাকে মুসলিম (সত্যের প্রতি সমর্পিত) হওয়ার জন্য আদেশ করা হয়েছে (সুরা ইউনুস ৭২)।***

এই বক্তারা এই লেনদেনের নাম দিয়েছেন হাদিয়া। কারণ হাদিয়া বা উপহার নেওয়া সুন্নত। সুন্নতের নাম ভাঙ্গিয়ে তারা সুস্পষ্ট হারাম একটি কাজ করে যাচ্ছেন। একে হারাম বললে তো আর মানুষ পয়সা দেবে না। মানুষ পয়সা দেবে সওয়াবের নিশ্চয়তা পেলে। তারা এজন্য কেবল সওয়াব নয়, জান্নাতের নিশ্চয়তা দিচ্ছেন। বলছেন, যা দিবেন হাতে, তাই যাবে সাথে। মন্দিরে মাদ্রাসায় দেওয়া অর্থের সিংহভাগই চলে যাচ্ছে কুমিরের পেটে। মাদ্রাসাগুলো থেকে যারা কোর'আন হাদিস, মাসলা মাসায়েল, দোয়া-কালাম মুখস্থ' করে বের হচ্ছেন, তারাও জীবিকা নির্বাহের জন্য একই উপায়ে ধর্মব্যবসাই করে যাচ্ছেন। প্রতিষ্ঠা করছেন নতুন নতুন মডেলের মাদ্রাসা- কোনোটা দেওবন্দি, কোনোটা আজহারি, কোনোটা মাদানি, কোনোটা আহলে হাদিস মাদ্রাসা। একেক মাদ্রাসায় একেক রঙের ইসলাম।

ইসলামের যে কোনো আমলের বা কাজের বিনিময় দিবেন আল্লাহ। তাই যারা মানুষের কাছ থেকে এর বিনিময় নেয় তাদের গৃহীত বিনিময় আসলে পরকালের বিনিময়ের তুলনায় কিছুই না, আল্লাহর ভাষায় তুচ্ছ মূল্য (সামানান কালিলা)। এই তুচ্ছ মূল্য নেওয়া যে হারাম এটা তারা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য, যেহেতু এটা কোর'আনে আছে। তবু তারা ধর্মীয় কার্যাদির বিনিময় গ্রহণকে হালাল মনে করেন, বলেন যে তারা যেটা নিচ্ছেন সেটা সামানান কালিলা নয়, পারিশ্রমিক নয়। এটা হাদিয়া। তাদের কাছে সবিনয়ে জানতে চাই, তাহলে কোনটা সেই বিনিময়, মজুরি যা নিতে রসুলগণ অস্বীকৃতি জানিয়েছেন? কোনটা সেই সামানান কালিলা যা গ্রহণ করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন? কোন কাজ করে বিনিময় নেওয়া যাবে না সেটা এখন জাতি জানতে চায়।

[লেখক: সাহিত্য সম্পাদক, হেযবুত তওহীদ; ফোন: ০১৬৭০১৭৪৬৫১, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৭১১৫৭১৫৮১]

সোনালি দিন

চোরগুলি কোথায় থাকবে?

রিয়াদুল হাসান

আমরা ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত দয়ালু, উদার ও দানশীল হাতেম তাঈয়ের নাম শুনে আসছি। তাঁকে নিয়ে গল্প পড়েছি, নাটক হয়েছে, এমনকি চলচ্চিত্রও হয়েছে বড় পর্দায়! অনেকের ধারণা, দাতা হাতেম তাঈ মূলত কাল্পনিক মানুষ বা গল্পের নায়ক। বাস্তবে এমন কোনো ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই। কিন্তু ইতিহাস বলে, আল্লাহর রাসুল (সা.) যখন মক্কা বিজয়ের পর আরবের ছোট ছোট শহর অধিকার করছিলেন, তখনও পার্শ্ববর্তী কিছু কিছু শহরে মূর্তিপূজা চলছিল। কুল্‌স ছিল 'তাঈ' গোত্রের পৌত্তলিকদের একটি বিশাল দেবালয়। এই দেবালয়ের দেবতাদের প্রতিমূর্তিগুলোকে 'এলাহ' এর তথা হুকুমদাতার আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। তাই এটাকে ধ্বংস করার জন্য রাসুলাল্লাহ (সা.) ১৫০ জন অশ্বারোহীসহ আলীকে (রা.) পাঠান।

হাইল শহরে একজন নামকরা ব্যক্তি ছিলেন হাতেম আত-তাই নামে গোত্রপ্রধান। যার নাম প্রায় সব আরবরাই জানত। তাঁর দানশীলতা ও উদারতা ছিল শিখরছোঁয়া এবং এটাই ছিল তাঁর খ্যাতির অন্যতম কারণ। এজন্য হাতেম তাঈ ছিলেন সেই গোত্রের প্রধান। তাঁর সময়টা ছিল ইসলাম পূর্ব সময়ে। তিনি ৫৭৮ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ রসুলাল্লাহ যখন আট বছরের বালক তখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে 'আদি ইবনে হাতেম' গোত্রের প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

আদি যখন জানতে পারলেন রসুলাল্লাহর অনুসারীরা তাঈ গোত্রের দিকে যুদ্ধযাত্রা করেছেন, তখন তিনি পালানোর রাস্তা খুঁজতে থাকেন। কিছু সম্পদসহ উট প্রস্তুত করে রাখেন। যখন নিশ্চিত হলেন মদিনার সৈন্যরা আসছে, তখন তিনি তাঁর গোত্রকে পরিত্যাগ করে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে সৌদি আরবের উত্তরে রোমানদের কাছাকাছি এক শহরে পালিয়ে আসেন। আদি আগেই খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে রোমানদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল। ওদিকে আলী (রা.) নেতৃত্বে মো'মেন মুজাহিদগণ তাঈ গোত্রকে পরাজিত করে কিছু যুদ্ধবন্দী ও তাদের গৃহপালিত পশুগুলোকে মদিনায় নিয়ে আসেন। হাতিম তাঈর কন্যা অর্থাৎ আদির ভগ্নি সফানাকেও সেখান থেকে বন্দি অবস্থায় মদিনায় আনা হয়। তিনি নিজের পিতার পরিচয় জানিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের দাবি জানান।

তাকে রাসুলাল্লাহর (সা.) নিকট আনা হলে তিনি রাসুলাল্লাহর (সা.) নিকট প্রার্থনা করলেন, 'হুযুর, আমি জগদ্বিখ্যাত দানবীর হাতিম তাঈর কন্যা। আমার ভাই আদি আপনার সেনা বাহিনীর ভয়ে আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে। আমি নিঃসহায় অবলা নারী। আপনি আমার প্রতি দয়া করুন, আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি দয়া করবেন।'

> ***রাসুল (সা.) বললেন, 'এটা শুধু সময়ের ব্যাপার, যখন কোনো নারী একাকি হিরা শহর থেকে মক্কায় কাবা তাওয়াফ করার জন্য আসবে। তার সঙ্গে একজনও নিরাপত্তাসঙ্গী থাকবে না। তার ভয়ের কোন কারণ থাকবে না। এটাও খুব শীঘ্রই ঘটবে যখন আমার উম্মাহ বাবেল নগরের শ্বেত প্রাসাদ পর্যন্ত জয় করবে। কিসরার (পারস্য সম্রাট) ধনভাণ্ডার আমাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে'।***

রাসুলাল্লাহ (সা.) সসম্মানে সফানাকে মুক্তি দিলেন এবং নির্বিঘ্নে বাড়িতে পৌঁছাবার জন্য একটি উট সঙ্গে দিয়ে দিলেন। এমন সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে সফানা খুব আনন্দিত হলেন। তিনি তাঁকে মুক্তি দিলেন শুধু হাতেম তাঈয়ের মেয়ে হওয়ার কারণে। তাঁর ভাই আদি আক্রমণের সময় বোনকে রেখে পালিয়ে গেছে শুনে রাসুলাল্লাহ (সা.) প্রথমে অনেকটা ক্রোধ প্রকাশ করেন। তারপর ফিরে গিয়ে ভাইকে পরামর্শ দিতে বলেন, সে যেন রাসুলাল্লাহর (সা.) সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে এবং আদিকে জানায়, 'মোহাম্মদ (সা.) যদি নবী হন, তাহলে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রেখে তাঁর ধর্ম যত তাড়াতাড়ি গ্রহণ করবে, ততই তাঁর মঙ্গল হবে। আর যদি তিনি রাজা হন, তাহলে সুসম্পর্ক গড়ে কিছু অনুগ্রহ বা সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা করতে পারে।'

বাড়িতে পৌঁছেই সফানা তার ভাইকে বলতে লাগলো, 'ভাইজান, রাসুলাল্লাহও (সা.) আমাদের শ্রদ্ধেয় পিতার ন্যায় অতি হৃদয়বান লোক। উনার

সদয় ব্যবহার দেখলে শত্রু-মিত্র কেউই তাঁর প্রশংসা না করে থাকতে পারে না। আপনি খুব দ্রুতই তাঁর সাথে দেখা করুন।'

এরপর রাসুলাল্লাহ (সা.) বললেন, 'হে লোকসকল, তোমরা অভাবগ্রস্ত হবে, এই আশঙ্কা আমার নেই। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সহায় থাকবেন। তিনি তোমাদেরকে এরূপ সম্পদশালী বানিয়ে দিবেন যে, একজন অবলা নারী মদিনা হতে একাকী 'হিরা' পর্যন্ত বরং তদপেক্ষা দূরবর্তী পথ ভ্রমণ করবে, অথচ তার অন্তরে চুরি হওয়ার কোন ভয়-আশঙ্কা থাকবে না।' আদি (রা.) বলেন যে, তখন আমি মনে মনে ভাবছিলাম 'তাঈ' গোত্রের চোরগুলি সে সময় কোথায় থাকবে?

পরবর্তী ঘটনা আদি ইবনে হাতেম নিজেই বর্ণনা করেন, 'মোহাম্মদ (সা.) এর চেয়ে আর কেউ আমার কাছে এত বিদ্বেষের ছিলেন না। কিন্তু আমি নিজেকে আশ্বাস দিয়ে বলতে লাগলাম, যদি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দেখি তিনি যা বলেন তা সত্য বাণী, তাহলে সরাসরি তাঁর কাছ থেকে শুনব আর যদি তা না হয়, তাতেও আমার তেমন ক্ষতির কিছু নেই। ভগ্নির কথায় উৎসাহিত হয়ে আমি কোন নিরাপত্তা ছাড়াই মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা করলাম।

তখন রাসুলাল্লাহ (সা.) মসজিদে ছিলেন। মদিনায় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোক আমাকে চিনে ফেলে এবং চিৎকার করে বলতে লাগল, 'সবাই দেখো, উনি হাতেম তাইয়ের ছেলে আদি' সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা অতিউৎসাহে তাঁকে ঘিরে ফেলল। তারা তাঁকে রাসুলুল্লাহর (সা.) কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, 'উনি হাতেম তাইয়ের ছেলে আদি।'

আমার পরিচয় পেয়ে তিনি আমাকে যথেষ্ট সম্মান ও অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর বললেন, ইয়া আদি, আসলিম তুসলিম' (হে আদি, ইসলাম গ্রহণ করো এবং তুমি নিরাপদ হবে)। আদি উত্তর দিলেন, 'আমি তো একটি ভালো ধর্মের অনুসারী।' রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও দুইবার বললেন, আদি একই উত্তর দিলেন। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'হে আদি, আমি তোমার ধর্ম সম্বন্ধে তোমার থেকে বেশি জানি। তুমি কি তোমার গোত্রের প্রধান নও?' আদি বললেন, 'হ্যাঁ'। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'তাদের আয়ের চার ভাগের এক ভাগ তোমরা কর হিসাবে নাও না?', 'হ্যাঁ, নেই।' তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'তুমি কি জানো যে তোমার নিজের ধর্ম এটা নিষেধ করে?' আদি কিছুটা লজ্জা পেলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) আদির হাত ধরে তাঁর ঘরের দিকে রওনা দিলেন।

'পথিমধ্যে এক শিশুসহ একজন বৃদ্ধা ওনাকে থামালেন এবং তাঁর সমস্যার কথা বলতে লাগলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) নারীটির আশ্বস্ত হওয়া পর্যন্ত কথা বললেন। আমরা তাঁর ঘরে এলে উনি এক পুরাতন ছেঁড়া মাদুর আমার নিচে দিয়ে বসতে বললেন। আমি তখন চিন্তা করছিলাম এই লোক সম্ভবত রাজা নন। আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে তাকিয়ে আর কিছু না দেখে তাঁকে বসতে বললাম। তিনি জোর করে আমাকেই বসতে বললেন। আমি মাদুরে বসে পড়তেই তিনি মাটিতে বসলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আর কোনো প্রভুকে জান কি না আল্লাহ ছাড়া? আমি উত্তর দিলাম, 'না'। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এমন কাউকে চিনো কি না, যে আল্লাহ থেকে বেশি ক্ষমতাবান ও শক্তিশালী? আমি আবার বললাম, 'না'। তখন তিনি বললেন, 'ইয়াহুদিরা আল্লাহর ক্রোধের পাত্র ও খ্রিষ্টানরা পথভ্রষ্ট এবং যা তারা বিশ্বাস করে তা ভুল'।

তারপর রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'তুমি বোধহয় ইসলাম গ্রহণ করছ না আমার আশপাশের মানুষগুলোর অবস্থা দেখে (রাজনৈতিক দুর্বলতা ও দারিদ্র্য ইত্যাদি)। তুমি কি হিরা শহরের নাম শুনেছ?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, শুনেছি। তবে কখনো যাইনি ওই শহরে'। নবী (সা.) বললেন, 'এটা শুধু সময়ের ব্যাপার, যখন কোনো নারী একাকি হিরা শহর থেকে মক্কায় কাবা তাওয়াফ করার জন্য আসবে।

তার সঙ্গে একজনও নিরাপত্তাসঙ্গী থাকবে না। তার ভয়ের কোন কারণ থাকবে না। এটাও খুব শীঘ্রই ঘটবে যখন আমার উম্মাহ বাবেল নগরের শ্বেত প্রাসাদ পর্যন্ত জয় করবে। কিসরার (পারস্য সম্রাট) ধনভাণ্ডার আমাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে'।

আমি তখন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন কিসরা, হরমুজের ছেলে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, কিসরা, হরমুজের ছেলে। আর প্রকৃতপক্ষে এটাও সময়ের ব্যাপারমাত্র যখন মানুষ মদিনার রাস্তায় ঘুরে ঘুরে সাদকা দিতে চাইবে কিন্তু একজনকেও সাদকা দেওয়ার যোগ্য পাবে না'। এটা শুনে আমি মুসলিম হয়ে গেলাম।

আদি (রা.) পরবর্তী জীবনের কথা মনে করে বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহর (সা.) তিনটি ভবিষ্যদ্বাণীর দুইটাই স্বচক্ষে দেখেছি। মুসলিম রাজ্যের শান্তি ও নিরাপত্তা নিজে দেখেছি এবং আমি নিজে তাতে অংশগ্রহণ করেছি। [এখানে ৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে পারস্য

সাম্রাজ্যের রাজধানী টেসিফান বিজয়ের যুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে।]

আদি বলেন, 'তারপর জনৈক আনসারী সাহাবীর ঘরে কিছুদিন অতিথিরূপে অবস্থান করলাম। প্রতিদিন সকালে ও বিকালে আমি রাসুলাল্লাহর (সা.) নিকটে হাজির হতাম। একদিন তাঁর নিকট একদল লোক এসে হাজির হল। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ধন-সম্পদ বাড়িয়ে দিয়ে তোমাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করেছেন। তোমরাও তা হতে অন্যদের দান করে আল্লাহর বান্দাদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। এটাই তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। একটি খেজুর কিংবা খেজুরের এক টুকরা হলেও আল্লাহর রাস্তায় দান কর। তাও যদি সম্ভব না হয় তবে মুখের মিষ্টি বাণী দিয়ে মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার কর। তোমাদের প্রত্যেকেরই আল্লাহর সম্মুখে হাজির করা হবে। তখন আল্লাহ তা'আলাও তোমাদেরকে এগুলো স্মরণ করিয়ে দিবেন। আল্লাহ বলবেন- 'আমি তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও সন্ততি দান করেছিলাম না?' বান্দা বলবে- হ্যাঁ। তখন আল্লাহ আবার বলবেন, 'আজকের জন্য তোমরা কি রেখেছ?' সে ডানে, বামে, সম্মুখে ও পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করে কিছুই পাবে না। তার দুনিয়ার কোন সম্পদই তাকে দোযখ থেকে রক্ষা করতে আসবে না।

আদি বলেন, 'তারপর জনৈক আনসারী সাহাবীর ঘরে কিছুদিন অতিথিরূপে অবস্থান করলাম। প্রতিদিন সকালে ও বিকালে আমি রাসুলাল্লাহর (সা.) নিকটে হাজির হতাম। একদিন তাঁর নিকট একদল লোক এসে হাজির হল। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ধন-সম্পদ বাড়িয়ে দিয়ে তোমাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করেছেন। তোমরাও তা হতে অন্যদের দান করে আল্লাহর বান্দাদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। এটাই তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। একটি খেজুর কিংবা খেজুরের এক টুকরা হলেও আল্লাহর রাস্তায় দান কর। তাও যদি সম্ভব না হয় তবে মুখের মিষ্টি বাণী দিয়ে মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার কর। তোমাদের প্রত্যেকেরই আল্লাহর সম্মুখে হাজির করা হবে। তখন আল্লাহ তা'আলাও তোমাদেরকে এগুলো স্মরণ করিয়ে দিবেন। আল্লাহ বলবেন- 'আমি তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও সন্ততি দান করেছিলাম না?' বান্দা বলবে- হ্যাঁ। তখন আল্লাহ আবার বলবেন, 'আজকের জন্য তোমরা কি রেখেছ?' সে ডানে, বামে, সম্মুখে ও পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করে কিছুই পাবে না। তার দুনিয়ার কোন সম্পদই তাকে দোযখ থেকে রক্ষা করতে আসবে না।

এরপর রাসুলাল্লাহ (সা.) বললেন, 'হে লোকসকল, তোমরা অভাবগ্রস্ত হবে, এই আশঙ্কা আমার নেই। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সহায় থাকবেন। তিনি তোমাদেরকে এরূপ সম্পদশালী বানিয়ে দিবেন যে, একজন অবলা নারী মদিনা হতে একাকী 'হিরা' পর্যন্ত বরং তদপেক্ষা দূরবর্তী পথ ভ্রমণ করবে, অথচ তার অন্তরে চুরি হওয়ার কোন ভয়-আশঙ্কা থাকবে না।' আদি (রা.) বলেন যে, তখন আমি মনে মনে ভাবছিলাম 'তাঈ' গোত্রের চোরগুলি সে সময় কোথায় থাকবে?

একবার আমি তাঁকে আমার পিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.), আমার বাবা তাঁর আত্মীয়স্বজনদের প্রতি ছিলেন সদয়, দয়ালু এবং মানুষের প্রতি খুব দানশীল, তিনি কি তাঁর কাজের প্রতিদান-পুরস্কার পাবেন?' রাসুলুল্লাহ (সা.) উত্তরে বললেন, 'তোমার বাবা যা কামনা-আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন তিনি তা পেয়েছেন।' (ইবনে হিব্বান)

আদি ইবনে হাতেম (রা.) বেঁচেছিলেন অনেক দিন, অনেকের মতে, ১২০ বছরের কাছাকাছি। তিনি ইসলামের তৃতীয় খলিফা ওসমান (রা.)-এর হত্যা দেখেছেন, তিনি ইসলামের চতুর্থ খলিফা হজরত আলীর (রা.) সঙ্গে মুয়াবিয়ার (রা.) বিরুদ্ধে সিফফিন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

[Dr.Qadi-i Seerah of Prophet (s)
থেকে সংকলিত]

ধর্মের রাজনীতি, তেল ব্যবসায়ী ও আমাদের শিক্ষা

হাসান মাহদী

সম্প্রতি ভারতে ক্ষমতাসীন বিজেপির দুই নেতা মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করার পর আরব দেশগুলোর সাথে ভারতের কিছুটা টানাপোড়েন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এক টিভি বিতর্কে করা মন্তব্য সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর এর কড়া সমালোচনা এবং প্রতিক্রিয়া দেখায় সৌদি আরব, কাতার, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বিভিন্ন উপসাগরীয় এবং আরব দেশগুলো। তাছাড়া বাংলাদেশের কয়েটি ইসলামী রাজনৈতিক দল বিক্ষোভ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তবে প্রশ্ন হচ্ছে কেন আরব দেশগুলো হঠাৎ এমন প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে? এর আগেও তো ভারতীয় বিজেপির নেতাকর্মীরা অশালীন হিংসা বিদ্বেষ ও উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়েছেন। তখন কেন মুসলিম দেশগুলোর চুপ ছিল?

২০১৫ সালে মে মাস থেকে ২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মাত্র আড়াই বছরে গরু রক্ষার নামে কট্টর হিন্দুত্ববাদীদের হামলায় ভারতে কমপক্ষে ৪৪ জন মারা গেছে এদের প্রায় সকলেই মুসলিম। এসব হত্যাকাণ্ডের বিচার-আচারও তেমন এগোয়নি বললেই চলে এবং বিজেপি নেতারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এসব হামলার পক্ষে সাফাই গেয়েছেন। তাছাড়া কিছুদিন আগে হিজাবের কারণে কর্ণাটাকে ছাত্রীকে হেনস্তা ঘটনা বিশ্বের সব বড় বড় মিডিয়ায় আসে।

ভারতে বসবাসরত মুসলিমরা প্রায়ই দমন নিপীড়নের শিকার হন। যদিও তার কিছুমাত্র ঘটনা শুধু মিডিয়াতে আসে। নিউইয়র্ক ভিত্তিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৫ সালে মে মাস থেকে ২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মাত্র আড়াই বছরে গরু রক্ষার নামে কট্টর হিন্দুত্ববাদীদের হামলায় ভারতে কমপক্ষে ৪৪ জন মারা গেছে এদের প্রায় সকলেই মুসলিম। এসব হত্যাকাণ্ডের বিচার-আচারও তেমন এগোয়নি বললেই চলে এবং বিজেপি নেতারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এসব হামলার পক্ষে সাফাই গেয়েছেন। তাছাড়া কিছুদিন আগে হিজাবের কারণে কর্ণাটাকে ছাত্রীকে হেনস্তা ঘটনা বিশ্বের সব বড় বড় মিডিয়ায় আসে। ছাত্রীদের স্কুল, কলেজ থেকে বহিষ্কার করা তার পক্ষে আদালত থেকে রায়ও দেয়া। তখন তো নূপুর শর্মার এই ঘটনার মতো প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশ বা মুসলিম বিশ্বে দেখা যায়নি। দেখা যায়নি কারণ যারা বিশ্ব রাজনীতির কলকাঠি নাড়ে তারা চায়নি বলে। কেন চায়নি সে প্রশ্নের উত্তর আশা করি পাবেন।

বিশ্বনবীকে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করলে যে ১৮০ মুসলিমদের কষ্ট লাগবে সেটাই স্বাভাবিক। এতো বড় একটা সংখ্যার মানুষের সেন্টিমেন্ট, আবেগ, ভালোবাসা তার কোন তোয়াক্কাই করছে না তারা। আর করবেই কেন?

যাইহোক, মহানবীকে নিয়ে অবমাননাকর বক্তব্যের আগ পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) জাতীয় মুখপাত্রের দায়িত্বে ছিলেন নূপুর শর্মা। প্রফেশনালদের জনপ্রিয় নেটওয়ার্ক লিংকডইন প্রোফাইল অনুসারে, নূপুর পেশায় একজন আইনজীবী। তিনি বিজেপির গুরুত্বপূর্ণ নেতা, পরিচিত মুখ। আর অপরজন হলেন বিজেপির দিল্লি শাখার তৎকালীন গণমাধ্যমপ্রধান নবীন কুমার জিন্দাল। কেন্দ্রে এবং রাজ্য পর্যায়ে বিজেপি এবং দলের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কট্টর হিন্দু গোষ্ঠীর নেতা-কর্মীরা ক্রমাগতভাবে মুসলমান এবং তাদের ধর্মবিশ্বাস, জীবন-জীবিকা টার্গেট করে বক্তব্য বিবৃতি দিয়ে চলেছে, যার জেরে গত আট বছরে বহু সহিংসতা-হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। কিন্তু কেন তারা ইসলামকে ধর্মকে টার্গেট করে বারবার এমন বক্তব্য দিচ্ছে?

ভারত যেহেতু হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ তাই রাজনৈতিক লাভের অশায়, জনগণের ভোটের আশায় বিজেপির অনেক নেতা-নেত্রী নিজেকে প্রকৃত হিন্দু বা সনাতন ধর্মের ধারকবাহক প্রমান করতে তারা অন্য ধর্মকে বিশেষ করে ইসলাম ধর্মকে টার্গেট করে বিভিন্ন সময় বিতর্কিত মন্তব্য করেন। এক কথায় নিজ ধর্মের প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ দিতে তারা অন্য ধর্মকে ছোট করে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন। সত্যি বলতে তারা আসলে নিজ ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ তাই সে অন্য ধর্মকে নিয়ে কটূক্তি করেন। কারণ তারা তার নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত নন। ধর্ম দিয়ে জাতি, রাষ্ট্রের বা সর্বসাধারণের কী কল্যাণ হবে সেটা

তারা জানেন না বলেই মনে হচ্ছে। যদি জানতেন তবে তারা সমাজ বা জাতি গঠনে নিজ ধর্মের ব্যবহার করতেন, অন্য ধর্মকে নিয়ে অশালীন, অবমাননাকর মন্তব্য করতেন না।

বিজেপি হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল তাদের নেতাকর্মীরা আসলে ধর্ম সম্পর্কে যতটুকু বলেন তা শুধু ভোটের আশায়। প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান মিশরের আল আজহার আল-শরীফ তাদের এক বিবৃতিতেও বলছে, "কিছু কট্টর লোকজনের ভোটের জন্য ইসলামের এমন অবমাননা উগ্রবাদের সমার্থক। এর ফলে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা এবং অবিশ্বাস জন্ম নেয়।" রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলে ধর্মকে ব্যবহার শুধু ভারতেই নয় বিশ্বের অনেক দেশই করছে। ইউরোপ আমেরিকার বড় বড় গণতান্ত্রিক দেশগুলাতেও দেখা যায় ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। আমাদের দেশেও কিছু ইসলামী রাজনৈতিক দল আছে, পূর্বেও ছিল। যারা ধর্মকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় যেতে যাচ্ছেন।

ইউক্রেনের সাথে যুদ্ধের কারণে রাশিয়া তেল খাত ইউরোপ ও আমেরিকার আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞায় পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) আপত্তি অগ্রাহ্য করেই ভারত রাশিয়া থেকে তেল কিনছে। রাশিয়াও ভারতকে তেল দিচ্ছে অনেকটাই কম দামে। এখানে মনে রাখতে হবে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বড় তেল আমদানিকারী দেশ। আর তেল উৎপদনকারী আরব দেশগুলোর নেতারা স্বাভাবিক চাইবেনা তাদের ক্রেতা অন্যদিকে যাক।

ভারতের ব্যাপারে যে প্রতিক্রিয়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো দেখিয়েছে তা কিন্তু ফ্রান্স বা ইসরাইলের কর্মকাণ্ডের জন্য দেখা যায়নি। তাদের পণ্য বর্জন করেননি। কেন করলেন না? আসলে কি তারা নবীর (সা.) কে ভালোবেসে ভারতীয় পণ্য বর্জন করছেন? নাকি অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কোনো কারণ আছে সেটাও দেখতে হবে। আমেরিকা ইপরোপে হোয়াইট সুপ্রিমেসি, ইসলাম ফোবিয়া বা অভিবাসন মতো ইস্যুগুলোকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য, তাদের ভোট ব্যাংককে সমৃদ্ধ করার জন্য। ফ্রান্স, ব্রিটেনের মতো দেশগুলো তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিস্টানদের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার একটা প্রবণতা দেখা যায়। কিছুদিন আগের ফ্রান্সের নির্বাচনের খবরগুলো একটু ঘাটাঘাটি করলেই সেই বিষয়ে স্পষ্ট হতে পারবেন।

ভারত যেহেতু হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ তাই রাজনৈতিক লাভের আশায়

একইভাবে ভারতের বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারও হিন্দুদের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় টিকে আছে। এবং আপনাদের এই বিক্ষোভ মিছিলের জন্য ভারতের সাধারণ হিন্দুরা আরও বেশি করে বিজেপিকে সমর্থন দেয়া শুরু করবে। পরবর্তী নির্বাচনেও হয়তো তারা আবরা ক্ষমতায় আসবে। আর যারা ভারতের পণ্য বয়কট করার চিন্তা করছে তা শুধু তেল বাণিজ্যর কারণে। বিষয়টা স্পষ্ট করছি।

ইউক্রেনের সাথে যুদ্ধের কারণে রাশিয়া তেল খাত ইউরোপ ও আমেরিকার আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞায় পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) আপত্তি অগ্রাহ্য করেই ভারত রাশিয়া থেকে তেল কিনছে। রাশিয়াও ভারতকে তেল দিচ্ছে অনেকটাই কম দামে। এখানে মনে রাখতে হবে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বড় তেল আমদানিকারী দেশ। আর তেল উৎপদনকারী আরব দেশগুলোর নেতারা স্বাভাবিক চাইবেনা তাদের ক্রেতা অন্যদিকে যাক। তাই হুমকি দিয়ে হোক বা ভয় দেখিয়ে, তেল বিক্রি করতে না পারলে তাদের বিলাসী জীবনের আসল মজা তারা পাবে না। তাছাড়া তাদের উপরে বসে থাকা মোড়লরাও এতে করে খুশি না। কারণ তাদের শত্রু রাষ্ট্রর কাছ থেকে ভারত জ্বালানি কিনছে।

যাইহোক, বিশ্বনবীকে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করলে যে ১৮০ মুসলিমদের কষ্ট লাগবে সেটাই স্বাভাবিক। এতো বড় একটা সংখ্যার মানুষের সেন্টিমেন্ট, আবেগ, ভালোবাসা তার কোন তোয়াক্কাই করছে না তারা। আর করবেই কেন? এই মুসলিম জনগোষ্ঠির বেশিরভাগই তো কতশত ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে। তাদের মধ্যে ঐক্য নেই, শৃঙ্খলা নেই। তারা নিজেরা নিজেরাই তো মারামারি কাটাকাটিতে ব্যস্ত।

আর যারা ক্ষমতায় আছেন তারা তো তাদের ক্ষমতার মোহে আটকে আছেন। বিলাসী জীবন যাপন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। যতদিন তারা শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে আল্লাহর দেওয়া কর্মসূচি গ্রহণ করবে না। পুরো মুসলিম জাতি ইস্পাত কঠিন ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হবে না ততদিন অন্যের দ্বারা অপমান লাঞ্ছনার শিকার হতে হবে।

মোহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর কোরবানি

রাকীব আল হাসান

একটা সমাজে যখন অন্যায় বিস্তারলাভ করে, মিথ্যা বিজয়ী হয়, মানুষে মানুষে অনৈক্য আর হানাহানি চলতে থাকে, অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করা হয়, ক্ষমতাবানদের কথাই সঠিক বলে গণ্য হয়, সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি আর প্রতারণা স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়, ধর্ষণ, ব্যভিচার নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে যায়, ধর্ম যখন ব্যবসার হাতিয়ারে পরিণত হয়ে যায় তখন বুঝতে হবে ঐ সমাজকে আর সংস্কার করা যাবে না বরং ঐ সমাজ ধ্বংস করে নতুন সমাজ নির্মাণ করতে হবে। নতুন সমাজ বিনির্মাণের জন্যই যুগে যুগে নবী-রসুল এসেছেন। সকল নবী-রসুলের সমাজ পরিবর্তনের মূলসূত্র একই, সেটা হলো- "তোমরা বলো, আমরা আল্লাহর হুকুম ছাড়া কারো হুকুম মানব না অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুমদাতা নেই।" এই কথা বলার সাথে সাথে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ, পূর্বের ধর্মের পুরোহিতগণ (আলেমগণ) সেই নবীর চরম বিরোধিতা শুরু করে দিয়েছে। নবীদের উপর, তাদের সঙ্গী-সাথী বা সাহাবাদের উপর অত্যাচার, নির্যাতন হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যাচার হয়েছে, দীনের উপর টিকে থাকাটাই একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আমি আমার আপন রসুলকে প্রেরণ করেছি হেদায়াহ ও সত্যদীন সহকারে, যেন তিনি এটাকে (ঐ হেদায়াহ ও সত্যদীনকে) অন্যান্য সমস্ত দীনের (জীবনব্যবস্থার) উপর প্রতিষ্ঠিত করেন, কায়েম করেন'। (সুরা তওবা- ৩৩; সুরা ফাতাহ- ২৮; সুরা সফ- ৯)।

এই পরিস্থিতিতে পুরাতন, পচা, মিথ্যাচ্ছন্ন ঐ সমাজ ধ্বংস করে নতুন এক সমাজ, নতুন এক সভ্যতা বিনির্মাণের জন্য এমন একদল মানুষের প্রয়োজন হয়েছে যারা সমাজ পরিবর্তনের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের জীবন, সম্পদ, সম্মান, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সর্বস্ব কোরবান দিতে প্রস্তুত। অর্থাৎ সমাজ পরিবর্তনের জন্য, দীন কায়েমের জন্য ত্যাগ, কোরবানি অপরিহার্য। এই কোরবানি মানে ১০ জিলহজে কেবল গরু জবাই করা কোরবানি নয় বরং ইব্রাহিম (আ.) এর মতো নিজের সন্তানকেও আল্লাহর রাস্তায় কোরবান করা লাগতে পারে, ইসমাইল (আ.) এর মতো নিজের গর্দান ছুরির নিচে সোপর্দ করা লাগতে পারে। এ কারণেই মুসলিম উম্মার শিক্ষা দেবার জন্য মহান আল্লাহ পবিত্র হজ অনুষ্ঠানে ইব্রাহিম (আ.) এর সেই কোরবানির ঘটনাকে স্মরণ করে পশু জবাই দেওয়াকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন সামর্থ্যবান হাজিদের জন্য।

এই সেই তায়েফের পাহাড়ী অঞ্চল যেখানে রসুলাল্লাহ তওহীদের আহ্বান প্রচার করতে গিয়ে রক্তাক্ত হয়েছিলেন। এভাবে তিনি তাঁর সমগ্র জীবন ও সম্পদকে কোরবান করে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। আজকে আমরা তাঁর সেই আত্মত্যাগের শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে নিছক পশু কোরবানি করে আত্মতৃপ্তি লাভ করছি।

রসুলাল্লাহ (সা.) ও তাঁর আসহাবগণ কেবল পশু জবাই করার মধ্যেই কোরবানিকে সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং তাঁরা তাঁদের জীবন ও সম্পদ পূর্ণরূপে আল্লাহর রাস্তায় কোরবান করে দিয়ে হেদায়াহ ও সত্যদীন কায়েম করেছেন, নতুন এক সমাজ বিনির্মাণ করেছেন, যাবতীয় অন্যায়, অবিচার, অশান্তি দূর করে ন্যায়, সুবিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

মোহাম্মদ (সা.) এর কোরবানি

অতীতে যত নবী-রসুল (আ.) এসেছেন তাঁরা সবাই এসেছেন একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল, নির্দিষ্ট গোত্র ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। নির্ধারিত অঞ্চল বা সমাজের বাইরে দীনের দাওয়াত দেওয়াও তাঁদের অনেকের জন্য নিষেধ ছিল। কিন্তু শেষ নবী মোহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এবং শেষ দীন ইসলাম এসেছে সমগ্র মানবজাতির জন্য,

সমগ্র পৃথিবীর জন্য। কেয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী-রসুল আসবেন না, আর কোনো দীন আসবে না।

> ***নব্যুয়তের সপ্তম বছরে যখন রসুলাল্লাহ (সা.) ও তাঁর আসহাবদের সাথে তাঁর গোত্র বনু হাশিমের লোকদেরকে শিয়াব'এ আবু তালিব-এ বন্দী করে রাখা হয় তখন তাঁদের দিন কেটেছে অনাহারে-অর্ধাহারে। কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের মধ্যে পড়তে হয়েছে তাঁদের। এমনও হয়েছে যে, কেবল গাছের লতা-পাতা খেয়ে কাটাতে হয়েছে দিনের পর দিন। পুষ্টিহীনতায় মায়েদের বুকে দুগ্ধ হয়নি, শিশুরা মারা গেছে বাবা-মায়ের চোখের সামনে। এই অবস্থা চলেছে তিন বছর। এই শিয়াব'এ আবু তালিবের বন্দী দশা থেকে মুক্তি পাবার পর আম্মা খাদিজা (রা.) পুষ্টিহীনতার কারণে ইন্তেকাল করেছেন। একই বছরে রসুলাল্লাহর (সা.) চাচা আবু তালিবকেও হারান। এরপর তায়েফে যান দীনের দাওয়াত নিয়ে, কিন্তু সেখানে শুধু প্রত্যাখ্যাতই হননি বরং চরমভাবে তাঁকে অত্যাচার করা হয়। পাথরের আঘাতে আঘাতে তাঁকে রক্তাক্ত করা হয়, বার বার তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন আবার জ্ঞান ফিরে হেঁটেছেন। এভাবে মক্কার ১৩ টি বছর কেটেছে অত্যাচার-নির্যাতন, অভাব-দারিদ্র নিয়ে।***

কাজেই মহানবী (সা.) এর দায়িত্ব নিঃসন্দেহে বিরাট। মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আমি আমার আপন রসুলকে প্রেরণ করেছি হেদায়াহ ও সত্যদীন সহকারে, যেন তিনি এটাকে (ঐ হেদায়াহ ও সত্যদীনকে) অন্যান্য সমস্ত দীনের (জীবনব্যবস্থার) উপর প্রতিষ্ঠিত করেন, কায়েম করেন'। (সুরা তওবা- ৩৩; সুরা ফাতাহ- ২৮; সুরা সফ- ৯)। অর্থাৎ আল্লাহ শেষ নবীর উপর দায়িত্ব দিয়েছেন এই শেষ দীনকে সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার। বোঝাই যাচ্ছে, এত বড় কাজ করতে কী অপরিসীম ত্যাগ, অপরিসীম কোরবানি লাগবে। মহানবী (সা.) যেদিন নবুয়্যত পেয়েছেন সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে তাঁর অপরিসীম কোরবানি, অসম্ভব ত্যাগ স্বীকার করা। নব্যুয়ত পাবার সাথে সাথে তিনি যখন আম্মা খাদিজার মাধ্যমে ওরাকা বিন নওফেলকে জানালেন তখন ওরাকা বিন নওফেল বলেছিলেন, খুব দ্রুতই আপনার আপনজনেরা আপনাকে ত্যাগ করবে, আপনার উপর অত্যাচার নেমে আসবে, আপনার নিজ জন্মস্থান থেকে আপনাকে বিতাড়িত করা হবে। কিছুদিনের মধ্যে সেটাই শুরু হলো।

আম্মা খাদিজা (রা.) ছিলেন মক্কার সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ী। কোনো কোনো ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, মক্কার বড় বড় ব্যবসায়ীদের মালামাল একসাথে করলেও আম্মা খাদিজার ব্যবসায়ের সমান হতো না। রসুলাল্লাহর সাথে বিয়ে হবার পর থেকে সেই ব্যবসা দেখাশুনা করতেন রসুলাল্লাহ (সা.) নিজে। তাঁর হাতের বরকতে ব্যবসা আরও বড় হতে থাকে। কিন্তু নব্যুয়তের পর এই ব্যবসাতে তিনি আর তেমন সময় দিতে পারতেন না, ফলে ব্যবসা সংকুচিত হতে থাকে। প্রথম দিকে যারা দীন গ্রহণ করেছেন তাদের বেশিরভাগ ছিল দাস-দাসী, অত্যন্ত দরিদ্র, সমাজের নিগৃহীত শ্রেণির মানুষ। তাদের বিপদ-আপদে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন রসুলাল্লাহ (সা.) ও কয়েকজন বিত্তশালী সাহাবাগণ। দীন প্রচারের কাজে যে অর্থ ব্যয় হতো তারও সিংহ ভাগ বহন করতেন রসুলাল্লাহ (সা.)। এভাবে তিনি একদিকে ধনী থেকে দরিদ্র হতে লাগলেন অপর দিকে সমাজের বেশির ভাগ মানুষ তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে লাগল। এক পর্যায়ে শুরু হলো নানামুখী অত্যাচার-নির্যাতন।

রসুলাল্লাহ (সা.) একদিকে ছিলেন উচ্চ বংশীয়, ক্বাবার মোতোয়াল্লী পরিবারের সন্তান, অন্যদিকে সফল ও ধনী ব্যবসায়ী। সততা, ন্যায়-নিষ্ঠতা, আমানতদারিতার জন্য তিনি ছিলেন সকলের নিকট সম্মানিত। বয়োজ্যেষ্ঠরাও তাঁকে সম্মান করত। তাঁর মুখের উপর কথা বলে এমন হিম্মত ঐ সমাজের কারো ছিল না। কিন্তু যখনই কলেমার দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন তখনই শুরু হয়ে গেল চরম বিরোধিতা। যারা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার হিম্মত রাখত না তারাও শুরু করল উপহাস করা। সালাহরত অবস্থায় তাঁর মাথার উপর উটের নাড়ি-ভুড়ি চাপিয়ে দেওয়া হলো, তাঁকে নানা অকথ্য ভাষায় গালাগাল করা হলো। কিন্তু তিনি সত্যের উপর রইলেন পর্বতের মতো অনড়, অটল। কোনোভাবেই যখন তাঁকে দমিয়ে রাখা যাচ্ছিল না তখন কুরাইশ নেতারা তাঁকে প্রস্তাব দিল- আরবের রাজত্ব, অর্থ-বিত্ত ও সুন্দরী নারী সব দেওয়া হবে যদি তিনি এই কলেমার বালাগ বন্ধ করে দেন। রসুলাল্লাহ (সা.) তাদের এই প্রস্তাবের জবাবে সেদিন বলেছিলেন, "আমার এক হাতে যদি চন্দ্র ও আরেক হাতে সূর্যও এনে দাও তবু মোহাম্মদ এই পথ (কলেমার পথ, সত্যের পথ) ছাড়বে না, হয় আল্লাহর বিজয় হবে না হলে এই রাস্তায় মোহাম্মদ শহীদ হয়ে যাবে।"

নব্যুয়তের সপ্তম বছরে যখন রসুলাল্লাহ (সা.) ও তাঁর আসহাবদের সাথে তাঁর গোত্র বনু হাশিমের

লোকদেরকে শিয়াব'এ আবু তালিব-এ বন্দী করে রাখা হয় তখন তাঁদের দিন কেটেছে অনাহারে-অর্ধাহারে। কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের মধ্যে পড়তে হয়েছে তাঁদের। এমনও হয়েছে যে, কেবল গাছের লতা-পাতা খেয়ে কাটাতে হয়েছে দিনের পর দিন। পুষ্টিহীনতায় মায়েদের বুকে দুগ্ধ হয়নি, শিশুরা মারা গেছে বাবা-মায়ের চোখের সামনে। এই অবস্থা চলেছে তিন বছর। এই শিয়াব'এ আবু তালিবের বন্দী দশা থেকে মুক্তি পাবার পর আম্মা খাদিজা (রা.) পুষ্টিহীনতার কারণে ইন্তেকাল করেছেন। একই বছরে রসুলাল্লাহর (সা.) চাচা আবু তালিবকেও হারান। এরপর তায়েফে যান দীনের দাওয়াত নিয়ে, কিন্তু সেখানে শুধু প্রত্যাখ্যাতই হননি বরং চরমভাবে তাঁকে অত্যাচার করা হয়। পাথরের আঘাতে আঘাতে তাঁকে রক্তাক্ত করা হয়, বার বার তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন আবার জ্ঞান ফিরে হেঁটেছেন। এভাবে মক্কার ১৩ টি বছর কেটেছে অত্যাচার-নির্যাতন, অভাব-দারিদ্র নিয়ে।

কিন্তু একটি মুহূর্তের জন্যও দীনের খেদমত থেকে তিনি পিছপা হননি, শিরক ও কুফরের সামনে মাথা নত করেননি। এরপর যখন তিনি মদীনায় আসলেন তখন তাঁকে মদীনার সমাজের প্রধান হিসাবে সকলে গ্রহণ করে নিল। মদীনাকে তিনি তৈরি করলেন এক আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে। কিছুদিনের মধ্যে শুরু হলো চতুর্দিকে অভিযান, যুদ্ধ, কেতাল। যুদ্ধ মানেই জীবনের ঝুঁকি, যুদ্ধ মানেই জীবন ও সম্পদের অসম্ভব কোরবানি। মাদানী জীবনের ১০ টা বছর রসুলাল্লাহকে (সা.) নিরন্তর কেবল যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়েছে, কেননা তাঁর লক্ষ্য ছিল সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর দেওয়া হেদায়াহ ও সত্যদীন প্রতিষ্ঠা করা। সামান্য ১০ বছরের এই সময়ে তিনি ছোট-বড় দিয়ে ১০৭টি অভিযান পরিচালনা করেন, ২৭ টি যুদ্ধাভিযানে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, যুদ্ধ করেছেন। উহুদ যুদ্ধে তিনি চরমভাবে আহত হয়েছেন, মাথার মধ্যে হেলমেট ঢুকে গিয়েছে, কয়েকটা দাঁত ভেঙ্গে গেছে, মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন, তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচার করেছে মোশরেকরা। কিছু নিবেদিতপ্রাণ সাহাবাদের অসম্ভব কোরবানির বিনিময়ে কাফের-মোশরেকরা রসুলাল্লাহ (সা.) কাছে পৌঁছুতে পারেনি। আহযাবের যুদ্ধে পরিখা খননে নিজে অংশগ্রহণ করেছেন, প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়েও কাজ করেছেন পেটে পাথর বেঁধে। তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই ৩২ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার ভূখণ্ডে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করে রেখে গেছেন। এত সংগ্রাম, এত যুদ্ধ জয়, এত ভূখণ্ড জয় করার পরও তাঁর ইন্তেকালের সময় সম্পদ বলতে তেমন কিছুই ছিল না, কেবল ছিল ৯ টি তরবারিসহ কয়েকটা যুদ্ধাস্ত্র আর চাটাইয়ের পাটি, খেজুরের খোসা ভর্তী বালিশ। এ থেকেই বোঝা যায় তাঁর জীবনে তিনি কেমন কোরবানি করেছেন। তিনি নিজের জীবনটাকে কোরবানি করার জন্য এমনভাবে আকাঙ্ক্ষা করেছেন যে, তিনি বলেন, আমার উপর যদি নব্যুয়তের মহান দায়িত্ব না থাকত তাহলে আমি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে যেতাম, আবার আল্লাহ আমাকে জীবিত করে দিতেন আমি আবার শহীদ হতাম- এভাবে চারবার শহীদ হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছেন। এই কোরবানি, এই ত্যাগের মাধ্যমেই তিনি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়েছেন। জীবন-সম্পদের এই অপরিসীম কোরবানির পাশাপাশি তিনি পশু কোরবানিও করেছেন। আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'একদা রসুলাল্লাহ (সা.) দুটি ধুসর বর্ণের শিংওয়ালা দুম্বা কোরবানি করছিলেন। তিনি 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে তা নিজ হাতেই জবাই করেছিলেন। হজরত আনাস বলেন, আমি মহানবীকে (সা.) এর পাঁজরের ওপর পা রাখতে দেখেছি এবং জবাই করার সময়ে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলতে শুনেছি (সহিহ মুসলিম)।

• আমাদের জন্য শিক্ষা

আমরা কোরবানির অর্থ বুঝি কেবল বছরের একটা নির্দিষ্ট দিনে পশু জবাই দেওয়া। সেই পশু জবাই করা কোরবানিটাও রসুলাল্লাহ (সা.) এর সুন্নাহ অনুসারে পালন করি না। তিনি নিজ হাতে পশু কোরবানি করতেন কিন্তু আমরা মোল্লা ভাড়া করে পশু কোরবানি করি। আমাদের সমাজে কোরবানি হয়ে গেছে এক প্রকার শো-অফ, কে কত বড় কোরবানি দিতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলে, আর কোরবানির গোস্ত ফ্রিজে রেখে সারা বছর সেটা ভক্ষণ চলে। কিন্তু রসুলাল্লাহ (সা.) এর জীবনী থেকে আমরা দেখতে পাই কীভাবে তিনি নিজের জীবন ও সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় অকাতরে বিলিয়ে গেছেন, কীভাবে তিনি দীনের কাজ করে গেছেন। এখন আমরা যদি সত্যকার অর্থে তাঁর অনুসরণ করতে চাই তাহলে আমাদেরকেও আল্লাহর দীন কায়েমে নিজেদের জীবন ও সম্পদ এভাবেই উৎসর্গ করতে হবে, কোরবানি করতে হবে। এই কোরবানির মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারব, মোকাররাবুন হতে পারব ইনশাল্লাহ।

[লেখক: সদস্য, সাহিত্য ও গবেষনা বিভাগ, হেযবুত তওহীদ]

আমার কোরবানি

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

আমার সৌভাগ্য যে, আমি মিয়ানমারের কোনো রোহিঙ্গা পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিনি, আমি ফিলিস্তিন, কাশ্মির, কাশগড়, ইউঘুর, সিনকিয়াং কিংবা বসনিয়া, চেসনিয়ার কোনো মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিনি। আমার সৌভাগ্য যে, আমি আফগান, ইরাক, সিরিয়া, ইয়েমেনের মতো কোনো যুদ্ধকবলিত ভূমিতে কিংবা আফ্রিকার দুর্ভিক্ষ পীড়িত কোনো অঞ্চলে জন্ম গ্রহণ করিনি। আমি জন্ম গ্রহণ করেছি সবুজ, শ্যামল এই স্বাধীন বাংলার এক মুসলিম পরিবারে। আমার বাল্যকাল কেটেছে গ্রামের মেঠো পথ, হাট-মাঠ-ঘাটে ছুটোছুটি করে, গ্রামের বন্ধুদের সাথে হৈ-হুল্লোড় করে। তখন আমি বসনিয়া, চেসনিয়ার মুসলমানদের করুণ দুর্দশা সম্পর্কে জানতাম না, ফিলিস্তিনের মুসলমানদের সম্পর্কে জানতাম না, কাশ্মির কিংবা আরাকান মুসলমানদের সম্পর্কেও কিছু জানতাম না। আফ্রিকার দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে আমার জ্ঞান ছিল না। তখন আমি কেবলই ভাবতাম- পৃথিবীর সবাই বুঝি আমাদের মতোই আনন্দ আর খুশিতে দিন পার করে, সবাই বুঝি আমাদের মতোই সুখ-স্বাচ্ছন্দের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। ভাবতাম দুনিয়াটা বুঝি খুবই সুন্দর, শান্তির জায়গা। উত্তরে-দক্ষিণে, পূর্বে-পশ্চিমে শুধুই সুখ আর সুখ। কারণ আমার বাড়ির চৌহদ্দি যেহেতু সুখময় তাই দুনিয়াটাও হয়ত সুখময়, শান্তিময়- এমনটাই ভেবেছি তখন।

বছরের বিশেষ বিশেষ দিনে আনন্দ বহুগুণ বেড়ে যেত। পহেলা বৈশাখে ছিল মেলা দেখতে যাওয়ার আনন্দ, মেলা থেকে এটা-ওটা কেনার আনন্দ আর রোজার ঈদে ছিল নতুন পোশাক পরার আনন্দ, এছাড়াও সেমাই খাওয়া, মিষ্টি খাওয়া, কোলাকুলি করা, বাঁশি বাজানো ইত্যাদি নানা রকমের আনন্দ তো ছিলই। তবে সবচেয়ে মজা হতো কোরবানির ঈদে। ঈদের কিছুদিন আগে থেকেই আমাদের অঞ্চলের গরুর হাট বেশ জমজমাট হয়ে উঠত। হাটে যেতাম গরু দেখতে। একসাথে এত গরু, এত বড় বড় সুন্দর গরু অন্য সময় দেখা যেত না। এত বড় হাট লাগত যে একবার আমি হারিয়েই গিয়েছিলাম। ঘুরে ঘুরে হাটে গরু দেখাটা ছিল বেশ আনন্দের। এর পরের আনন্দটা ছিল গরু কেনা। আব্বা যেদিন কোরবানির গরু কিনে আনতেন তার পর থেকে সারাদিন গরুর সাথে সাথে থাকতাম। গরুকে এটা ওটা খাওয়ানো, গায়ে হাত দিয়ে আদর করা, এমনকি গরুটাকে দেখতেও যেন আনন্দ লাগত। তারপর আসত প্রতীক্ষিত সেই ঈদের দিন। বড় বড় চাকু ধার দেওয়া হতো, লম্বা জোব্বা পরা এক মৌলভি সাহেব আসতেন গরু জবাই দিতে।

> ***এই কোরবানি কেবল মো'মেনদের জন্য। মহান আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে পরিষ্কারভাবে বলেই দিয়েছেন যে, "আমি মো'মেনদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছি জান্নাতের বিনিময়ে।" (সুরা তওবা-১১১)।***

মৌলভি সাহেবের সেই চেহারা তখন শিশু মনে বেশ ভয়ঙ্কর লাগত। মুখে কোনো হাসি নেই, হাতে তলোয়ারের মতো মস্ত এক ধারালো ছুরি, দাত কিড়মিড় করছে আর একটার পর একটা পশু জবাই দিচ্ছে তারপর কিছু টাকা নিয়ে বিদায় নিচ্ছে। মুরুব্বীরা বলতেন কোরবানির গরু দেখলে সওয়াব হয়, তাই জবাই দেওয়া থেকে শুরু করে রান্না হওয়া পর্যন্ত সবকিছু খুব ভালোভাবেই পর্যবেক্ষণ করা হতো। প্রথমেই কলিজা বের করে এনে রান্না করা হতো, সবাই মিলে খেতাম। একে একে মগজ, গোস্ত সব খাওয়া হতো। সব শেষে পাগুলো এবং ভুড়ি রান্না করে খাওয়া হতো। বেশ কিছুদিন ধরে মহানন্দে চলত খাওয়া। তখন কোরবানি বলতে এই খাওয়ার উৎসবটাই বুঝতাম। একটু বড় হয়ে ইব্রাহীম (আ.) এর বড় ছেলেকে কোরবানি দেবার ঘটনা জানলাম মকতব থেকে। তারপর থেকে কোরবানির ঈদে আর আনন্দ করতে পারতাম না, মনমরা হয়ে শুধু ভাবতাম- আমি বাবার বড় ছেলে। যদি মহান আল্লাহ দয়া করে সেদিন ছুরির নিচ থেকে ইসমাইলকে (আ.) সরিয়ে না নিতেন তবে তো তার উম্মতরাও নিজের বড় ছেলেকে এভাবে কোরবানি দিতেন। আব্বা যদি আমাকেও কোরবানি করতেন, যদি মানুষ আমাকে জবাই করে এভাবে কলিজা বের করে নিত, যদি আমার চোখ দুটো বের করে নিত- এগুলো চিন্তা করে আমি আর আনন্দ করতে পারতাম না, মন খারাপ করে বসে থাকতাম। আরেকটু বড় হয়ে যখন মনের মধ্যে যুক্তিবোধ জন্ম নিতে থাকল

তখন নানা রকম প্রশ্ন মাথায় আসতে লাগল। ভাবতে লাগলাম পশু জবাইয়ের তাৎপর্য কী? এতে আনন্দেরই বা কী আছে? হিসাব মিলাতে পারছিলাম না, কারো কাছে সন্তোষজনক উত্তরও পেলাম না।

তারপর সময় পার হতে লাগল, আমি বড় হতে থাকলাম, কলেজ জীবন পার হলো, ভার্সিটি জীবন পার হলো। এরপর একজন মহামানবের সন্ধান পেলাম। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলো, জীবনের সত্যিকারের অর্থ বুঝতে পারলাম, ইসলামের উদ্দেশ্য জানলাম, কোরবানির তাৎপর্য জানলাম। আমি তখন পরিষ্কার দেখতে পেলাম ইব্রাহিম (আ.) কোরবানির কী দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, রসুলাল্লাহ (সা.) কোরবানির কী শিক্ষা আমাদের জন্য রেখে গেছেন। সেই উপলব্ধি থেকেই আজকের এই লেখা।

বর্তমানে কোরবানির নামে যে ভোগের নির্লজ্জ মহড়া চলছে সেটা যে আসলে কোরবানি নয় তা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আমার প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর "শহীদী ঈদ" কবিতায় খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বর্তমানের এই লোক দেখানো কোরবানির অর্থহীনতা এবং সত্যিকারের কোরবানি কী সেটাও তুলে ধরেছেন। আরও পরিষ্কার হলো- মুসলিম নামক এই জাতির বর্তমান অবস্থা দেখে। আমি বুঝলাম কোরবানি মানে হলো ত্যাগ। জীবন এবং সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় অর্থাৎ মানুষের কল্যাণে ব্যয় করাই হলো আসল কোরবানি। আর এই কোরবানি কেবল মো'মেনদের জন্য। মহান আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে পরিষ্কারভাবে বলেই দিয়েছেন যে, "আমি মো'মেনদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছি জান্নাতের বিনিময়ে। (সুরা তওবা-১১১) " । এক সময় প্রশ্ন আসত যে, মো'মেনের জীবন ও সম্পদ নিয়ে আল্লাহ কী করবেন, তিনি তো বে'নেয়াজ, তাঁর তো কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। আল্লাহই আমার জান দিয়েছেন করুণা করে, দয়া করে। তিনি আবার এটা কেন নিবেন? আমি আমার শিক্ষাগুরু, সেই মহামানব এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর কাছ থেকে জানতে পারলাম আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল দেওয়ার অর্থ, কোরবানি করার অর্থ। আল্লাহর চাওয়া হচ্ছে- তাঁর প্রিয় এই সৃষ্টি মানুষকে ন্যায়, সুবিচার ও শান্তিতে রাখা। তাই মানবসমাজে ন্যায়,

সুবিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করাই হলো আল্লাহর সেই চাওয়া পূর্ণ করা, এটাই মানুষের প্রধান ইবাদত। এজন্য মানুষের কল্যাণে জীবন ও সম্পদ ব্যয় করাই হলো কোরবানি। অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় তথা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায়, মানুষের মুক্তির জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য যে যত বেশি জীবন ও সম্পদ কোরবানি করবে সে জান্নাতে তত বেশি নিয়ামত প্রাপ্ত হবে- এটাই হলো প্রকৃত কোরবানি। এটা বোঝার পর আমি আমার জীবনকে, আমার সম্পদকে সত্যিকারের কোরবানি করতে মনস্থির করলাম। কোরবানি শব্দটি এসেছে 'কুর্‌ব' থেকে যার অর্থ 'নৈকট্য'। সত্যিকারের কোরবানি আল্লাহর নৈকট্য এনে দেয়, আল্লাহর নিকটে যাওয়া যায়। যে আল্লাহর নৈকট্য পাবে তার কোনো হতাশা, বেদনা, দুঃখ, যন্ত্রণা, না পাওয়ার কষ্ট কিছুই থাকবে না। আল্লাহ হলেন সন্তুষ্টির উৎস, সমস্ত রেদোয়ানের উৎস। যিনি তার সবচেয়ে নৈকট্য পাবেন তিনি সমস্ত ক্লেদ থেকে মুক্ত হবেন। আমি সেই কোরবানি দেয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমি আমার সংসার, সন্তান-সন্ততি নিয়ে যে দুনিয়ামুখি ভোগ-বিলাসী জীবনযাপন করতে পারতাম তার কোরবানি দিলাম। আমি বেছে নিলাম অতি সাধারণ জীবন। স্ত্রী-পুত্রকে সেভাবে সময় দিতে পারলাম না, নামি-দামি স্কুলে সন্তানকে পড়ানোর চিন্তা বাদ দিলাম, তাদেরকে দামি দামি পোশাক পরানোর চিন্তা বাদ দিলাম, আরাম-আয়েশের চিন্তা বাদ দিলাম। কোনোমতে সাধারণ স্কুলে পড়তে দিলাম, একেবারে অশিক্ষিত তো আর রাখতে পারি না।

সর্বপ্রথম আমি ভাবলাম আমার শিক্ষাকে মানুষের কল্যাণে কোরবানি দেব। আর দশজন মানুষ যেমন শিক্ষা অর্জন করে ভালো চাকরি করার জন্য, ভালো টাকা উপার্জন করার জন্য ঠিক তেমনি আমার বাবাও আমাকে লেখা-পড়া শিখিয়েছেন বড় আমলা বানানোর জন্য। ছোটবেলা থেকেই পরীক্ষায় ভালো

ফলাফলের জন্য যেমন সকলের ভালোবাসা পেয়েছি, তেমনি পরিবারের লোকজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই আমাকে নিয়ে বড় বড় স্বপ্ন দেখেছেন।

শিক্ষকরা আমাকে অনেক ভালোবাসতেন। কলেজে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীরা আমাকে সম্মান করেছে, ভালোবেসেছে। কলেজের স্মরণকালে সর্বশ্রেষ্ঠ ফলাফল এনে দিয়েছিলাম, তাই সকলের ভালোবাসা, দোয়া পেয়েছি। যারাই ভালো রেজাল্ট করতো তারাই তো বড় বড় চাকুরি করত, বড় বড় আমলা হতো। সেটা দেখে এক প্রতিবেশি মুরুব্বি বলতেন- তুই বড় হয়ে সচিবালয়ের বড় সচিব হবি, গাড়ি হাঁকিয়ে গ্রামে আসবি, সবার মুখ উজ্জ্বল হবে, তোকে নিয়ে সবাই গর্ব করবে। কিন্তু লেখাপড়া শেষে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমার এই শিক্ষা দিয়ে আমি উপার্জন করব না বরং মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করব, দেশ ও জাতির কল্যাণে এই শিক্ষাকে উৎসর্গ করব, সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমার জ্ঞানকে আমি কোরবানি করব। সত্য প্রতিষ্ঠার এই কন্টকাকীর্ণ, বন্ধুর পথে তো এখন বড় বড় শিক্ষিত মানুষজন খুব একটা আসতে চান না, অধিকাংশ মানুষ তাদের জ্ঞানকে কেবল ভোগ-বিলাসের জোগান দিতে কাজে লাগান। আমি বেছে নিলাম কাঁটা বিছানো এই কঠিন পথ।

এরপর সিদ্ধান্ত নিলাম আমার যৌবনকালকে কোরবানি করার। মানুষের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময় তার যৌবনকাল, আমি সেই শ্রেষ্ঠ সময়কে কোরবানি করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবার জন্য মনস্থির করলাম। আব্বা প্রায়ই আমাকে বলতেন, যৌবনকাল শেষ হয়ে গেলে আর রুজি করতে পারবি না, এখনই রুজি কর, তাহলে বৃদ্ধ বয়সে স্বস্তি পাবি। কিন্তু আমি সেই ভাবনা দূরে সরিয়ে দিলাম, বৃদ্ধ বয়সে কী হবে সেই চিন্তা বাদ দিয়ে বরং চিন্তা করলাম আজ আমার জাতির কী অবস্থা, মানুষের আজ কী অবস্থা, সমাজের আজ কী অবস্থা! চিন্তা করলাম- এই সমাজ, এই দেশ, এই মানুষগুলো আমার যৌবনকালকে চায়, আমার স্রষ্টা আমার যৌবনকালকে চান, কাজেই আমি আমার যৌবনকে কোরবান করলাম স্রষ্টার নৈকট্য পেতে। হাদিসে আছে- সাত শ্রেণির মানুষ হাশরের দিন আরশের নিচে ছায়া পাবে। তাদের মধ্যে একটা শ্রেণি হলো- যারা আল্লাহর রাস্তায় (সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায়, মানুষের কল্যাণে) নিজের যৌবনকালকে ব্যয় করবে।

আমি আমার সংসার, সন্তান-সন্ততি নিয়ে যে দুনিয়ামুখি ভোগ-বিলাসী জীবনযাপন করতে পারতাম তার কোরবানি দিলাম। আমি বেছে নিলাম অতি সাধারণ জীবন। স্ত্রী-পুত্রকে সেভাবে সময় দিতে পারলাম না, নামি-দামি স্কুলে সন্তানকে পড়ানোর চিন্তা বাদ দিলাম, তাদেরকে দামি দামি পোশাক পরানোর চিন্তা বাদ দিলাম, আরাম-আয়েশের চিন্তা বাদ দিলাম। কোনোমতে সাধারণ স্কুলে পড়তে দিলাম, একেবারে অশিক্ষিত তো আর রাখতে পারি না। তারপর কোরবানি দিলাম বন্ধু-বান্ধব আর আত্মীয়-স্বজনদেরকে নিয়ে যে প্রচলিত সামাজিকতা আছে সেটার। আমি চিন্তা করলাম আমার সমস্ত সময় ব্যয় করব মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে। মানুষকে সত্য বোঝাতে হবে, প্রকৃত ধর্ম বোঝাতে হবে। সেই সমস্ত বন্ধু-বান্ধব আর আত্মীয়-স্বজনকে ত্যাগ করলাম যারা স্বার্থের পক্ষে, যারা মানবতার বিপক্ষে। অথচ একসময় এই বন্ধুদের সাথেই অনেক সময় ব্যয় করেছি আড্ডা দিয়ে।

প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় আমার যে সম্মান ছিল সেটা কোরবানি দিয়ে কোনো রকমে চলার জন্য সাধারণ ব্যবসা বেছে নিলাম। সেই ব্যবসা থেকেও উপার্জিত অর্থ আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি করার সিদ্ধান্ত নিলাম। যখন যাবতীয় অন্যায়কে প্রত্যাখ্যান করলাম, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলাম, সমাজে প্রচলিত অন্যায়গুলোর স্বরূপ তুলে মানুষকে সচেতন করতে লাগলাম তখন হুমকি আসলো জীবনের উপর। আমি প্রস্তুতি নিলাম জীবনকে কোরবানি দেবার জন্য। আমার বাড়িতে চার চারবার হামলা করা হলো, বাড়ি-ঘর লুট করে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো, দু'জন ভাইকে হত্যা করা হলো। আমাকে হত্যা করার জন্য তারা বারবার ষড়যন্ত্র করেও ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু আমি আমার জীবনকে সত্য প্রতিষ্ঠায় কোরবানি দেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত আছি। এটাই আমার কোরবানি, এটাই আমার আনন্দ, এটাই আমার ঈদ। এখন আল্লাহর নিকট আমার চাওয়া- তিনি যেন আমার এই জীবন-যৌবন-সম্পদ সমস্ত কিছু কবুল করেন, বিনিময়ে মানবজাতিকে একটা সত্য, ন্যায়, সুবিচার ও শান্তিপূর্ণ সমাজ উপহার দেন এবং আমাকে তাঁর নৈকট্য দান করেন। হাশরের দিন মিল্লাতের বাবা ইব্রাহিম (আ.) এর সামনে গিয়ে নতমস্তকে দণ্ডায়মান হয়ে যেন বলতে পারি আপনার পবিত্র পুত্রকে কোরবানি দিয়ে যে শিক্ষা রেখে গিয়েছিলেন সে শিক্ষা আমি ধারণ করেছি। আমার প্রিয় নবীজীর সম্মুখে যেন লাব্বায়েক ইয়া রসুলাল্লাহ বলে দণ্ডায়মান হয়ে বলতে পারি, আপনি সমস্ত সাহাবিদের যে কোরবানি শিখিয়েছেন সেই কোরবানি দেওয়ার জন্য আপনার নগন্য গুনাহগার উম্মত চেষ্টা করেছি। তবেই আমার জীবন সার্থক হবে। আমিন।

আমরা কি সত্যিই আল্লাহর এবাদত করছি?

মোহাম্মদ আসাদ আলী

আল্লাহ জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবাদত করার জন্য (সুরা যারিয়াত ৫৬) একথা আমরা মোটামুটি সবাই জানি। কিন্তু এবাদত বলতে কী বোঝায় সেটা কি আমরা জানি? আমরা অধিকাংশ মুসলিম মনে করি- নামাজ পড়া, রোজা রাখা, হজ্ব করা, জিকির আজকার করা, কুরআন তেলাওয়াত করা এগুলোই হচ্ছে এবাদত। শুধু এগুলো করার জন্যই আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আসলে কিন্তু তা নয়। নামাজ রোজা হজ্ব যাকাত ইত্যাদি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ আমল এতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু যে এবাদত করার জন্য আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন এগুলো তা নয়। তাহলে কী সেই এবাদত? আসুন জেনে নেওয়া যাক।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ মুসা (আ.) কে বলছেন, 'আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোনো ইলাহ (হুকুমদাতা) নেই, অতএব আমার এবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাহ কায়েম কর (সুরা ত্বা-হাঃ ১৪)।

এবাদত শব্দের সংজ্ঞা দেওয়া যায় এভাবে- 'যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সেই কাজটি করাই তার এবাদত।' যেমন আল্লাহ সূর্য সৃষ্টি করেছেন আলো ও তাপ দেওয়ার জন্য। কোটি কোটি বছর সূর্য আলো ও তাপ বিতরণের কাজ করেই যাচ্ছে। এটাই সূর্যের এবাদত। এখন মানুষের এবাদত যদি আমরা জানতে চাই, তাহলে সবার আগে জানতে হচ্ছে মানুষকে আল্লাহ কী কাজ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। ওই কাজ করাটাই হবে মানুষের ইবাদত।

প্রশ্ন হলো, আল্লাহ কি মানুষকে কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন? হ্যাঁ করেছেন। সেই কাজ সম্পর্কে আমরা জানতে পারি পবিত্র কোর'আনের সুরা বাকারার ৩০ নম্বর আয়াতে। এই আয়াতে মানুষ সৃষ্টির ঘটনা বলতে গিয়ে আল্লাহ পাক বলেন- 'স্মরণ করো যখন তোমার রব মালায়েকদের ডেকে বললেন, নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে খলিফা সৃষ্টি করব।' তাহলে এই আয়াতে বোঝা গেল আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর খলিফা হিসেবে। খলিফা আরবি শব্দ, এর অর্থ প্রতিনিধি (Representative)। তার মানে মানুষের কাজ হলো আল্লাহর খেলাফত করা, আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করা।

খেলাফত বা প্রতিনিধি শব্দটা আমরা সবাই বুঝি। ধরুন, আপনার কোনো কাজ আপনি নিজে না করে অন্য কাউকে দায়িত্ব দিলেন, ওই কাজটা আমার হয়ে করে দাও। তখন ওই ব্যক্তিটি হবে আপনার প্রতিনিধি বা খলিফা। আল্লাহর কাজ হচ্ছে সৃষ্টিজগতকে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করা। সেই কাজটাই আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন পৃথিবীতে। সুতরাং মানুষ আল্লাহর হুকুম দিয়ে, আল্লাহর আদেশ নিষেধ প্রতিষ্ঠা করে দুনিয়াতে ন্যায়, শান্তি, সুবিচার ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত রাখবে- এটাই মানুষের প্রধান কাজ, এবাদত।

দুঃখজনক বিষয় হলো- বর্তমানে আমরা এবাদত বলতে সেটা বুঝি না। আমরা এবাদত বলতে বুঝি দুনিয়ায় কী চলছে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে, দুনিয়াবিমুখ হয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে আল্লাহর উপাসনা, প্রার্থনা ইত্যাদি করা। এটা এবাদত তো নয়-ই বরং স্বার্থপরতা। সারা দুনিয়ার মানুষকে অসহায়ভাবে ফেলে রেখে, তাদের পাশে না দাঁড়িয়ে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কিছু না বলে, নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা- এটা যদি স্বার্থপরতা না হয় তাহলে স্বার্থপরতা আর কাকে বলে? আল্লাহ এই স্বার্থপরতা চান না। আল্লাহ চান মো'মেনরা প্রকৃত এবাদত করুক, অর্থাৎ নিজেদের সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করুক।

ধরুন আপনি গভীর রাত্রে প্রার্থনায় মগ্ন। হঠাৎ পাশের বাড়ি থেকে 'আগুন আগুন' বলে আর্তচিৎকার ভেসে এল। আপনি কী করবেন? দৌড়ে যাবেন সাহায্য করতে নাকি চোখ-কান বন্ধ করে প্রার্থনা চালিয়ে যাবেন। যদি আগুন নেভাতে যান সেটাই হবে আপনার এবাদত। আর যদি ভাবেন- বিপন্ন ব্যক্তি অন্য ধর্মের লোক, তাহলে আপনার মধ্যে মানুষের ধর্ম নেই, আপনার নামাজ-রোযা, প্রার্থনা সবই হচ্ছে পণ্ডশ্রম।

এবার আসি দলিল প্রমাণে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ মুসা (আ.) কে বলছেন, 'আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোনো ইলাহ (হুকুমদাতা) নেই, অতএব আমার এবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাহ কায়েম কর (সুরা ত্বা-হাঃ ১৪)। পাঠক, আল্লাহ কী

বললেন আবার খেয়াল করুন- আমার এবাদত করো এবং আমার স্মরণার্থে সালাহ কায়েম কর। আয়াত থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এবাদত ও নামাজ আলাদা বিষয়। এজন্যই আল্লাহ আলাদা আলাদা শব্দ ব্যবহার করেছেন। এখানে মুসা (আ.) এর দায়িত্ব অর্থাৎ এবাদত কী ছিল তা আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিলেন। বললেন, 'ফেরাউনের নিকট যাও, সে দারুণ উদ্ধত হয়ে গেছে (সুরা ত্বা-হা: ২৪)। আল্লাহ তাঁকে ফেরাউনের কাছে পাঠালেন অত্যাচারিত, নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ইহুদি জাতিকে দাসত্বের কবল থেকে মুক্ত করে তাদের মানবাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য, মানবতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ঠিক একইভাবে শেষ নবীর এবাদত অর্থাৎ দায়িত্ব ছিল সমস্ত পৃথিবীতে আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অন্যায়, অবিচার, অনিরাপত্তা, হানাহানি বন্ধ করা। উম্মতে মোহাম্মদী হিসেবে সেই এবাদত এখন আমাদের করার কথা, কিন্তু আমরা তা করছি না। বরং দুনিয়াকে ইবলিশের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা ব্যক্তিগত উপাসনা, প্রার্থনা ইত্যাদিতে মগ্ন আছি আর ভাবছি খুব এবাদত করা হচ্ছে। না পাঠক, মোটেও এবাদত হচ্ছে না।

যে ব্যক্তি মানবতার কল্যাণে সংগ্রাম করবে না, খেলাফতের কাজ করবে না, অন্য মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ঘোঁচাতে সম্পদ ব্যয় করবে না, তার তাহাজ্জুদ হবে ঘুম নষ্ট করা, রোযা হবে না খেয়ে থাকা (হাদিস)

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে কি নামাজ, রোযা, হজ করতে হবে না? হ্যাঁ, অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু উদ্দেশ্য বুঝে। যখনই একদল মানুষ পৃথিবীতে ন্যায়, শান্তি, সুবিচার ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আরম্ভ করবেন অর্থাৎ আল্লাহর প্রকৃত এবাদত করতে চাইবেন, তখনই তাদের কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিস দরকার পড়বে। যেমন- তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, শৃঙ্খলিত হতে হবে, নেতার প্রতি প্রশ্নহীন দ্বিধাহীন শর্তহীন আনুগত্যশীল হতে হবে, অন্যায় ও অসত্যকে পরিহার করতে হবে এবং জান-মাল দিয়ে সংগ্রাম চালাতে হবে। ওই মানুষগুলোর বুকভরা সাহস লাগবে, লক্ষ্য অর্জনের দৃঢ় মনোবল লাগবে, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব লাগবে, ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা লাগবে। মূলত এই গুণগুলো সৃষ্টির প্রশিক্ষণই (Training) হচ্ছে নামাজ, রোযা, হজ্ব ইত্যাদি। এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমল, যা মো'মেনদেরকে আল্লাহর ইবাদত করতে সহায়তা করবে। আসলে এই আমলগুলো ছাড়া মো'মেনরা ঐক্য, শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের মধ্যে থাকতেই পারবে না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহসই পাবে না, কাজেই ইবাদতও করতে পারবে না। ইবাদত করতে অবশ্য অবশ্যই নামাজ রোজা হজ্ব ইত্যাদি লাগবেই লাগবে। কিন্তু তারপরও মনে রাখতে হবে, এগুলোই মো'মেন জীবনের উদ্দেশ্য নয়, এগুলো উদ্দেশ্য অর্জনের প্রশিক্ষণ। উদ্দেশ্য হচ্ছে খেলাফত, অর্থাৎ আল্লাহর এবাদত করা।

যে ব্যক্তি মানবতার কল্যাণে সংগ্রাম করবে না, খেলাফতের কাজ করবে না, অন্য মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ঘোঁচাতে সম্পদ ব্যয় করবে না, তার তাহাজ্জুদ হবে ঘুম নষ্ট করা, রোযা হবে না খেয়ে থাকা (হাদিস); অন্য আমলের কী দশা হবে ভেবে দেখুন। আল্লাহর রসুল ও তাঁর সাহাবীরা প্রকৃত এবাদত তথা খেলাফতের কাজ করতে গিয়ে আজীবন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন এবং তা করতে গিয়ে তাঁরা নিঃস্ব হয়ে গেছেন। অথচ এখন মানুষকে এবাদতের নামে ভিন্ন শিক্ষা দেওয়া হয়। এখন মনে করা হয় এবাদত হলো পরকালীন বিষয়। অথচ আল্লাহ কোর'আনে বলেছেন- তিনি মো'মেনদেরকে দুনিয়াতে কর্তৃত্ব দান করবেন। (সুরা নুর: ৫৫) সেই কর্তৃত্ব নিয়ে মো'মেনরা কী করবে অর্থাৎ তাদের এবাদত বা দায়িত্ব কী হবে- সেটাও তিনি বলে দিয়েছেন পরিষ্কার ভাষায়। তিনি বলেছেন- 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। মানবজাতির মধ্য থেকে তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার জন্য। (ইমরান: ১১০)' সেই দায়িত্ব আজ কে পালন করছে? কেউ না। দেখা যাচ্ছে যে যত বড় ধার্মিক সে তত বেশি নির্বিরোধী, সে তত বেশি দুনিয়াবিমুখ। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার ইচ্ছা বা সাহস কোনোটাই তাদের থাকে না। কারণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোকে তারা এবাদত মনে করেন না, এবাদত বলতে কেবল নামাজ-রোযাই বোঝেন।

এবাদতের সঠিক ধারণা অতি সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। জানি না কতজন বুঝবেন। যদি একজনও এই কথাগুলো থেকে আল্লাহর প্রকৃত এবাদতের ধারণা লাভ করতে পারেন, তাহলে সেটাই আমার অনেক বড় অর্জন হবে।

[লেখক: সাহিত্য সম্পাদক, হেযবুত তওহীদ; ফোন: ০১৬৭০১৭৪৬৫১, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৭১১৫৭১৫৮১]

পদ্মা সেতু উদ্বোধন

বাঙালির দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণ

সাঈদ বিন তারিক

২০২২ সালের পঁচিশে জুন, এ দিনটির কথা ভুলবে না বাংলার মানুষ। কারণ এ দিনটিই কোটি মানুষের স্বপ্ন পূরণ হওয়ার দিন। পদ্মা সেতু নিছক স্টিলের কোনো কাঠামো নয়, পদ্মা সেতু আমাদের আবেগের নাম। জাতীয় অহংকার ও সাহসের আরেক নাম। সক্ষমতার প্রতীক। আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামের এক উজ্জ্বল মাইলফলক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এদিন পদ্মা সেতু এলাকায় গিয়ে সেতুটির উদ্বোধন করেন।

প্রথম দিকে পদ্মা নদীর তলদেশের মাটি খুঁজে পেতে বেগ পেতে হয় সেতু নির্মাণকারী প্রকৌশলী ও বিশেষজ্ঞদের। তলদেশে স্বাভাবিক মাটি পাওয়া যায়নি। সেতুর পাইলিং কাজ শুরুর পরে সমস্যা দেখা যায়। প্রকৌশলীরা নদীর তলদেশে কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় মাটির বদলে নতুন মাটি তৈরি করে পিলার গাঁথার চেষ্টা করে। স্ক্রিন গ্রাউটিং নামের এই পদ্ধতিতেই বসানো হয় পদ্মাসেতু। এরকম পদ্ধতির ব্যবহারের নমুনা বিশ্বে তেমন একটা নেই।

তিন তিনটি বিশ্ব রেকর্ড মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পদ্মা সেতু। চল্লিশ তলার সমান পাইলিং, দশ হাজার টনের বেশি ধারণ ক্ষমতার বেয়ারিং আর নদী শাসনে এ মেগা স্ট্রাকচার গড়েছে বিশ্ব রেকর্ড। সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ হলে একশ বিশ বছরেও কিছু হবে না এ সেতুর। খরস্রোতার দিক দিয়ে আমাজনের পরেই পদ্মার অবস্থান। পানি প্রবাহের দিক থেকে বিশ্বে শীর্ষে। তেমন একটি নদীকে বশে আনা ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। এমন বহুরূপি একটি নদীর তলদেশে পাইলিং করতেও কম বিপাকে পড়তে হয়নি। একেকটি পিলারের নীচের মাটি ছিল একেক রকম। শেষ পর্যন্ত ১২০ থেকে ১২৮ মিটার পাইলিং করতে হয়েছে। পিলারের ওপর দশ হাজার ৫০০ টন সহনশীল বেয়ারিং বসানো হয়েছে, যা একটি বিশ্ব রকের্ড। আবার রেকর্ড পরিমাণ নদী শাসন করেই বাগে আনতে হয়েছে পদ্মাকে।

পদ্মা বহুমুখী সেতুর সম্পূর্ণ নকশা এইসিওএমের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরামর্শকদের নিয়ে গঠিত একটি দল তৈরি করে। অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরীকে ১১ সদস্যের বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। এ প্যানেল সেতুর নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রকল্প কর্মকর্তা, নকশা পরামর্শক ও উন্নয়ন সহযোগীদের বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান করে।

পদ্মা সেতুর ভৌত কাজকে মূলত পাঁচটি প্যাকেজে ভাগ করা হয়েছে যথা- (ক) মূল সেতু, (খ) নদী শাসন, (গ) সংযোগকারী সড়ক, (ঘ) টোল প্লাজা ইত্যাদি। মাওয়া সংযোগকারী সড়ক, টোল প্লাজা ইত্যাদি এবং মাওয়া ও জাজিরা সার্ভিস এলাকা। প্রকল্পে নিয়োজিত নকশা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান 'মনসেল-এইকম' ভৌত কাজের ঠিকাদার নিয়োগের প্রাক-যোগ্যতা দরের নথি প্রস্তুত, টেন্ডার আহ্বানের পর টেন্ডার নথি মূল্যায়ন, টেন্ডার কমিটিকে সহায়তাসহ এ-সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ প্যানেল নকশা পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কাজ তদারক করত। ভৌত কাজের বিভিন্ন প্যাকেজের জন্য দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছিল। পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের পরিচালক ছিলেন কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির সভাপতি।

প্রথম দিকে পদ্মা নদীর তলদেশের মাটি খুঁজে পেতে বেগ পেতে হয় সেতু নির্মাণকারী প্রকৌশলী ও বিশেষজ্ঞদের। তলদেশে স্বাভাবিক মাটি পাওয়া যায়নি। সেতুর পাইলিং কাজ শুরুর পরে সমস্যা দেখা যায়। প্রকৌশলীরা নদীর তলদেশে কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় মাটির বদলে নতুন মাটি তৈরি করে পিলার গাঁথার চেষ্টা করে। স্ক্রিন গ্রাউটিং নামের এই পদ্ধতিতেই বসানো হয় পদ্মাসেতু। এরকম পদ্ধতির ব্যবহারের নমুনা বিশ্বে তেমন একটা নেই। এ প্রক্রিয়ায় ওপর থেকে

পাইপের ছিদ্র দিয়ে কেমিক্যাল নদীর তলদেশে পাঠিয়ে মাটির শক্তিমত্তা বাড়ানো হয়েছে। তারপর ওই মাটিতে গেঁথে দেওয়া হয়েছে পিলার। এমন পদ্ধতির প্রয়োগ বাংলাদেশে এই প্রথম। এ পদ্ধতিতে পাইলের সঙ্গে স্টিলের ছোট ছোট পাইপ ওয়েল্ডিং করে দেওয়া হয়। পাইপের ভেতর দিয়ে এক ধরনের কেমিক্যাল পাঠিয়ে দেওয়া হয় নদীর তলদেশের মাটিতে। কেমিক্যালের প্রভাবে তখন তলদেশের সেই মাটি শক্ত রূপ ধারণ করে। একপর্যায়ে সেই মাটি পাইলের লোড বহনে সক্ষম হয়ে ওঠে। তখন আর পাইল বসাতে কোনো বাধা থাকে না।

প্রকল্প ব্যয়: পদ্মা সেতু নির্মাণে মোট খরচ করা হচ্ছে ৩০ হাজার ১৯৩ দশমিক ৩৯ কোটি টাকা। এসব খরচের মধ্যে রয়েছে সেতুর অবকাঠামো তৈরি, নদী শাসন, সংযোগ সড়ক, ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পরিবেশ, বেতন-ভাতা ইত্যাদি। বাংলাদেশের অর্থ বিভাগের সঙ্গে সেতু বিভাগের চুক্তি অনুযায়ী, সেতু নির্মাণে ২৯ হাজার ৮৯৩ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে সরকার।

শুরুর কথা: ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জোরেশোরে শুরু হয় পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রক্রিয়া। প্রথমদিকে বিশ্বব্যাংক, জাইকা ও এডিবি এবং আইডিবি এ প্রকল্পে অর্থায়নে আগ্রহী হয়। এ প্রকল্পে ১২০ কোটি ডলার ঋণ দেওয়ার কথা ছিল বিশ্বব্যাংকের। কিন্তু ২০১১ সালে হঠাৎ করেই দুর্নীতির চেষ্টার অভিযোগ এনে ২০১২ সালে এ প্রকল্প থেকে সরে দাঁড়ায় বিশ্বব্যাংক। অভিযোগ ছিল, কানাডীয় কোম্পানি এসএনসি-লাভালিনকে কাজ পাইয়ে দিতে দুর্নীতির চেষ্টা হচ্ছে। এতে সরকারি, বেসরকারি কর্মকর্তা ও এসএনসি-লাভালিনের কর্মকর্তারা জড়িত। এ নিয়ে কানাডার আদালতে মামলা হয়। পরবর্তীতে ২০১৪ সালে দুর্নীতির চেষ্টা অভিযোগকে মিথ্যা আখ্যা দিয়ে কানাডার আদালত থেকে রায় দেওয়া হয়। এরপর বিশ্বব্যাংক অর্থায়নে ফিরে আসতে চাইলেও সরকার সংস্থাটির সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। সেই বছরের ডিসেম্বরেই এ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু হয় নিজস্ব অর্থায়নে।

প্রকল্প ব্যয়: পদ্মা সেতু নির্মাণে মোট খরচ করা হচ্ছে ৩০ হাজার ১৯৩ দশমিক ৩৯ কোটি টাকা। এসব খরচের মধ্যে রয়েছে সেতুর অবকাঠামো তৈরি, নদী শাসন, সংযোগ সড়ক, ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পরিবেশ, বেতন-ভাতা ইত্যাদি। বাংলাদেশের অর্থ বিভাগের সঙ্গে সেতু বিভাগের চুক্তি অনুযায়ী, সেতু নির্মাণে ২৯ হাজার ৮৯৩ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে সরকার। ১ শতাংশ সুদ হারে ৩৫ বছরের মধ্যে সেটি পরিশোধ করবে সেতু কর্তৃপক্ষ। এর আগে ২০০৫-এ পদ্মা সেতু নির্মাণের প্রাথমিক ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছিল ১২ হাজার কোটি টাকা। ২০০৭-এর আগস্ট মাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে একনেকের সভায় পদ্মা সেতুর চূড়ান্ত প্রাক্কলন করা হয় ১০ হাজার ১৬১ কোটি টাকা। পরবর্তীতে ২০১১ সালের ১১ জানুয়ারিতে ব্যয় সংশোধন করে ধরা হয়েছিল ২০ হাজার ৫০৭ কোটি টাকা। সময়ের পরিক্রমায় তা ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি: এ সেতুর বাস্তবায়নের ফলে দক্ষিণবঙ্গের ২১টি জেলার সঙ্গে ঢাকাসহ সারা দেশে সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হতে যাচ্ছে। এতে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) অন্তত ১ দশমিক ২ শতাংশ বাড়বে। এ সেতুর বাস্তবায়ন হওয়ায় পরিবহন খাতে বিনিয়োগ হবে অন্তত ২০০ কোটি টাকা। বিপুলসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে ২১ জেলাজুড়ে। তৈরি হবে নানারকমের শিল্প-কারখানা। বাড়বে কৃষিজ উৎপাদন। সহজ হবে পণ্য পরিবহন ব্যবস্থা। মানুষের আয় বাড়বে। পরিবর্তন হবে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের। কৃষি খাতেও আসবে ব্যাপক পরিবর্তন।

২০১৮ সালের ২ জানুয়ারি ছাত্রদলের এক সভায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া তাচ্ছিল্য করে বলেছিলেন, পদ্মা সেতু এই আওয়ামী লীগের আমলে হবে না। জোড়াতালি দিয়ে বানানো সেতুতে, কেউ উঠবেও না। এরপর একের পর এক পদ্মা সেতু বিরোধী মন্তব্য আসতে থাকে বিএনপি নেতাদের পক্ষ থেকে।

দিতে হবে টোল: মোটরসাইকেল নিয়ে পদ্মা সেতু পার হতে চাইলে টোল দিতে হবে ১০০ টাকা। কার ও জিপের জন্য ৭৫০ টাকা আর পিকআপের জন্য ১ হাজার ২০০ টাকা দিতে হবে। মাইক্রোবাসে লাগবে ১ হাজার ৩০০ টাকা। বাসের জন্য আসনের ভিত্তিতে তিন ধরনের টোল নির্ধারণ করা হয়েছে। ছোট বাসে (৩১ আসন বা এর কম) ১ হাজার ৪০০ টাকা, মাঝারি বাসে (৩২ আসন বা এর বেশি) ২ হাজার টাকা এবং বড় বাসে (৩ এক্সেল) ২ হাজার ৪০০ টাকা টোল দিতে হবে। পণ্যবাহী বাহনের ক্ষেত্রে ছোট ট্রাক

(৫ টন পর্যন্ত) ১ হাজার ৬০০ টাকা, মাঝারি ট্রাক (৫ থেকে ৮ টন) ২ হাজার ১০০ টাকা, মাঝারি ট্রাক (৮ থেকে ১১ টন) ২ হাজার ৮০০ টাকা, ট্রাক (৩ এক্সেল পর্যন্ত) ৫ হাজার ৫০০ টাকা এবং ট্রেইলার (৪ এক্সেল পর্যন্ত) পার হতে ৬ হাজার টাকা টোল দিতে হবে। চার এক্সেলের বেশি হলে ট্রেইলারে ৬ হাজার টাকার সঙ্গে প্রতি এক্সেলে বাড়তি ১ হাজার ৫০০ টাকা দিতে হবে টোল বাবদ। গত ১৭ মে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে টোলের এই হার জানানো হয়েছে। এসব যানবাহন থেকে প্রতিদিন অন্তত ৪ কোটি টাকার টোল আদায় করবে সেতু বিভাগ।

যত ষড়যন্ত্র: এ সেতু ঘিরে ছিল নানা ষড়যন্ত্র। ছিল দুর্নীতির কল্পিত অভিযোগ। এ ছাড়াও ২০১৮ সালের ২ জানুয়ারি ছাত্রদলের এক সভায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া তাচ্ছিল্য করে বলেছিলেন, পদ্মা সেতু এই আওয়ামী লীগের আমলে হবে না। জোড়াতালি দিয়ে বানানো সেতুতে, কেউ উঠবেও না। এরপর একের পর এক পদ্মা সেতু বিরোধী মন্তব্য আসতে থাকে বিএনপি নেতাদের পক্ষ থেকে। রাজনৈতিক বিরোধিতার সুরে তাল মিলিয়ে 'কান নিয়ে গেছে চিলে' এমন রব তোলেন কয়েকজন সুশীলও। সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার পদ্মা সেতু নিয়ে বলেছিলেন, দুর্নীতি আমাদের কীভাবে পেছনে নিয়ে যাচ্ছে তার আরেকটি উদাহরণ এটি (পদ্মা সেতু)। জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। সরকার সেতু প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ অস্বীকার করায় দুঃখ পান ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেছিলেন, প্রথম অভিযোগ পাওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের মনোভাব হলো অভিযোগ অস্বীকার করে যাওয়া। অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে কিছু কিছু ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে দাতাগোষ্ঠীর আস্থা অর্জন করতে পারেনি। অপরদিকে দুদকের বিচার করার ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেছিলেন, দুদকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল কোনো প্রমাণ মেলেনি। কিন্তু কানাডার পুলিশ এসে এ দুর্নীতির প্রমাণ দিয়ে গেছে। এ ঘটনা নিয়ে তদন্ত করার সামর্থ্য আছে কিনা দুদকের, সেটি নিয় আমার সন্দেহ রয়েছে। এ ঘটনার তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা তাদের আছে কিনা সেটি নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

পদ্মা সেতু বিরোধী নানা মহলের সমালোচনায় বিদ্ধ হতে হয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থ উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমানকে। সে সময়ে সংবাদমাধ্যমে ড. মসিউর রহমান আর্তি জানিয়ে বলেছিলেন, আপনাদের কাছে আমি সহানুভূতি চাই। আপনারা আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন। শেষমেশ বাধ্যতামূলক ছুটিতে যেতে হয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থ উপদেষ্টাকে, দেড় মাস জেল খাটেন সেতু সচিব, ২০১২ সালের ৫ জানুয়ারি পদত্যাগই করতে হয় তখনকার যোগাযোগমন্ত্রী আবুল হোসেনকে। দফায় দফায় তাদের হাজিরা দিতে হয় দুদকে। সৈয়দ আবুল হোসেন ২০১২ সালের ৩ ডিসেম্বর দুদক কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সংবাদমাধ্যমে বলেছিলেন, কোনো অসৎ কাজে প্রাক্তন যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন জড়িত নয়।

যানবাহন থেকে প্রতিদিন অন্তত ৪ কোটি টাকার টোল আদায় করবে সেতু বিভাগ।

আরেকটু পেছনে ফেরা যাক, সেতুর অর্থায়নে শুরুতে এডিবি, এরপর যোগ দেয় বিশ্বব্যাংক। উন্নয়ন সংস্থাগুলো যোগ দিতে থাকে অর্থায়নে। এরপর কথিত দুর্নীতির অভিযোগ তুলে অর্থায়ন থেকে সরে যেতে থাকে সংস্থাগুলো। তাদের একটার পর একটা আবদার রক্ষার চেষ্টা করেও বিশ্বব্যাংককে ফেরানো যায়নি পদ্মায়। পরে জানা যায়, বয়সসীমা পার হয়ে যাওয়ায় গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদ থেকে ড. ইউনুসকে সরিয়ে দেয়ায় অর্থায়ন থেকে সরে যায় বিশ্বব্যাংক। ২০১২ সালের ২৫ জুলাই লন্ডনে এক আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, যখন (পদ্মা সেতুতে) পরামর্শ নিয়োগের বিষয় এলো, তখন একটা কোম্পানির জন্য তারা (বিশ্বব্যাংক) বার বার চাপ দিচ্ছিল সরকারকে এবং যোগাযোগমন্ত্রীকে। যেন ওই কোম্পানিকে পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয়। এখন যদি আমি প্রশ্ন করি, বিশ্বব্যাংক কত পার্সেন্ট টাকা খেয়ে ওই কোম্পানির জন্য তদবির করেছে? কল্পিত সব অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ হতে সময় লাগেনি বেশিদিন। ২০১৭ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি রায় দেন কানাডার আদালত। রায়ে বলা হয়, পদ্মা সেতুতের দুর্নীতির অভিযোগ গালগপ্প ছাড়া কিছুই নয়। দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের যে ক্ষতের জন্ম দেয় শেষ পর্যন্ত নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মার মূল সেতুর কাজ শেষ হওয়ায় তা দেশের সক্ষমতা আর শৌর্যের প্রমাণ হয়ে এখন দাঁড়িয়ে পদ্মার বুকে।

সন্তানের বয়ঃসন্ধিকালে মা-বাবার ভূমিকা

ডা. সুলতানা রাজিয়া

আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল ও শিশু আইন অনুযায়ী ১-১৮ বছর বয়সী সকল ছেলে-মেয়েকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তবে এর মধ্য আবার কিছু ভাগ রয়েছে। যেমন-

ক. ১-৫ বছর- শৈশবকাল
খ. ৬-১০ বছর- বাল্যকাল
গ. ১১-১৮ বছর- কৈশরকাল
ঘ. ১৮থেকে শুরু হয় যৌবনকাল

বয়ঃসন্ধিকাল হলো শৈশব থেকে যৌবনকালে পদার্পনের মধ্যবর্তী সময়। আরো সহজভাবে বলতে গেলে বয়ঃসন্ধিকাল হলো বয়সের সন্ধিকাল। সন্ধি অর্থ হচ্ছে যেকোনো দুইটি জিনিসের মিলনস্থল। একটি মানুষ যখন তার বয়সের একটি স্তর থেকে অন্য একটি স্তরে পদার্পন করে তখন বয়সের এই সংযোগ সময়কে বলা হয় বয়ঃসন্ধিকাল। ১০ থেকে ১৯ বছরের কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধি বা টিনএজার বলা হয়।

বয়ঃসন্ধিতে থাকা ছেলে মেয়েরা ভীষণ কৌতূহলপ্রবণ হওয়ায় অনেক সময় তাদের বিপথগামী হওয়ার, মাদকের নেশায় জড়িয়ে পড়া, অযাচিত ঝুঁকি নেয়া বা অপসংস্কৃতিতে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

বয়সন্ধিকালের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য ঃ

বয়ঃসন্ধিকাল হলো এমন একটি সময় যখন একজন কিশোর পুরুষে পরিণত হয় এবং একজন কিশোরী নারীতে পরিণত হয়। এ সময় কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন শুরু হয়। এই পরিবর্তনগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

১) শারীরিক পরিবর্তন
২) মানসিক পরিবর্তন
৩) আচরণিক পরিবর্তন

• ১. বয়সন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তন:

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে মেয়েরা আকস্মিক কিছু দৈহিক পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়। ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে এ পরিবর্তনগুলো আলাদা হয়। যেমন: ছেলেদের ক্ষেত্রে এ সময় উচ্চতা ও ওজন বৃদ্ধি পায়, পেশি দৃঢ় হয়, বুক ও কাঁধ চওড়া হয়, দাড়ি, গোঁফ গজায়, গলার স্বর ভাঙ্গে ও স্বর ভারী হয়, বা বীর্যপাত ঘটে এবং এ

সময় ছেলেরা বেশি ঘামে। মেয়েদের ক্ষেত্রে উচ্চাত বৃদ্ধি পায়, শরীরের বিভিন্ন অংশ স্ফীত হয়, বাহুমূল ও যৌনাঙ্গে লোম গজায়, মাসিক শুরু হয়। বয়ঃসন্ধির এ সময়টায় ছেলে ও মেয়ের উভয়ের প্রজনন ক্ষমতা বিকাশ হতে থাকে ও বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ তৈরী হয়।

এই বয়সে ছেলে মেয়েদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার সুযোগ দিতে হবে এবং বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করতে হবে যাতে তারা যেকোনো বিষয় শেয়ার করতে সাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

• ২. বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক পরিবর্তন :

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েরা যৌন ক্ষমতা অর্জন করে। দেহের আকস্মিক পরিবর্তন তার মনোজগতের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। তাই, কিশোর-কিশোরীদের মনে এক ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

ক. মানসিক পরিবর্তনগুলো হলো:
খ. অজানাকে জানার আগ্রহ তৈরি হয়।
গ. আকস্মিক শারীরিক পরিবর্তনের কারণে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও লজ্জা কাজ করে।
ঘ. স্বাধীনভাবে চলাফেরার আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়।
ঙ. আপনজনদের কাছে স্নেহ ভালোবাসাপাওয়ার তীব্র ইচ্ছা জন্মে।

চ. সহজেই আবেগতাড়িত হয়।

ছ. মানসিক পরিপক্বতা হতে শুরু করে।

• **৩. বয়সন্ধিকালে আচরণিক পরিবর্তন:**

কখনো কখনো আমরা তাদেরকে ছোট হিসেবে ধরে নিয়ে কথা বলি। আবার আমরাই তাদেরকে বড়ুর কাতারে ঠেলে দিই। যেমন আমরা প্রায়শই তাদেরকে এমন কথা বলে থাকি যেমন-

-তুমি এখনও ছোট নেই, ছোটদের মত আচরণ করো না।

আবার কখনও বলি,

- তুমি বড়দের কথার মধ্যে আছো কেন? বা বড়দের মধ্যে কথা বলছো কেন? তুমি ছোট মানুষ। দূরে থাকো!!

মনোবিজ্ঞানী এরিকসনের তত্ত্ব অনুযায়ী, "শিশুরা তাদের বয়স এবং ভূমিকার মধ্য যখন দ্বিধাদ্বন্দের মধ্যে পড়ে যায় তখন তারা ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়। তারা এই ঝুকি মোকাবেলা করতে পারে না, কেননা শারীরিক পরিবর্তনের কারনে তারা খুব লজ্জা পায় বা দ্বিধা দ্বন্দে ভুগতে পারে।" বয়ঃসন্ধিকালে যে ধরনের মানসিক পরিবর্তনগুলো লক্ষ করা যায় তা হলো:

ক. এ সময় কিশোর-কিশোরীরা বড়োদের মতো আচরণ করতে চায়।

খ. নিজেকে স্বতন্ত্র পরিচয়ে প্রকাশ করতে চায়।

গ. নিজস্ব মতামত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে।

ঘ. আবেগময় আচরণ করে।

ঙ. বীরত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে আগ্রহ বাড়ে ইত্যাদি।

বাবা-মা তার সন্তানকে এ বয়স সম্পর্কে এবং বয়সে শারীরিক পরিবর্তন সম্পর্কে ভয়ভীতি দূর করে ইতিবাচক ধারণা তৈরিতে সাহায্য করবে। খুব সহজ সরলভাবে বাবা-মা তাদের সন্তানদেরকে বুঝাবে যে এ বিষয়টা অস্বাভাবিক কিছু নয় এটা সবার জীবনেই ঘটে এবং ঘটবে। এটা প্রাকৃতিক। তাদের জীবনেও যে এই বিষয়গুলো ঘটে গেছে তা শেয়ার করবে।

• **বয়ঃসন্ধিকালে পরিবারের কী ভূমিকা থাকতে পারে?**

১. বয়ঃসন্ধিতে থাকা ছেলে মেয়েরা ভীষণ কৌতূহলপ্রবণ হওয়ায় অনেক সময় তাদের বিপথগামী হওয়ার, মাদকের নেশায় জড়িয়ে পড়া, অযাচিত ঝুঁকি নেয়া বা অপসংস্কৃতিতে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। সেক্ষেত্রে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনকে সচেতন ভূমিকা রাখতে হবে। এখানে পরিবারের ভূমিকা অনেক বেশি। তাই এ সময় তাদের সঠিক পথে রাখতে পরিবারকে কৌশলী ভূমিকা পালন করতে হবে।

২. এই বয়সটাতে ছেলে মেয়েরা বাবা মায়ের চাইতে বন্ধুবান্ধবদের দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। অনেকেই বাবা মায়ের বাধা মেনে নিতে পারে না, রেগে যায়। এ বিষয়গুলো বাবা মায়ের পক্ষে নেয়াও কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু তাদের ধৈর্য হারালে চলবে না। বাবা মায়ের তাদের আচার আচরণের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে, তাদের মতামতের গুরুত্ব দিতে হবে।

৩. এক্ষেত্রে সন্তানের সাথে রাগারাগি করা বা তর্ক করা যাবে না। এছাড়া তুলনা করা, ছোট করে কথা বলা যাবে না। এতে করে তারা বাবা-মায়ের সাথে বন্ধুত্বপর্ণ আচরণ করবে না বরং বিগড়ে যাওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে।

৪. তাদের মতামতের গুরুত্ব দেয়ার মানে আবার এই নয় যে তারা যা বলবে তাই মেনে নিতে হবে। বরং সন্তানের পছন্দ, অপছন্দের প্রতি সম্মান জানিয়ে সেটা বুঝিয়ে বলতে হবে। যেন তার অসম্মানে আঘাত না আসে আবার ভাল-মন্দের ব্যবধানটাও বোঝানো যায়।

৫. এই বয়সে ছেলে মেয়েদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার সুযোগ দিতে হবে এবং বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করতে হবে যাতে তারা যেকোনো বিষয় শেয়ার করতে সাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

৬. শিশুদের মতো কড়া নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না।

৭. তাদের ব্যাগ চেক করা, মোবাইল চেক করা, ডায়রি খুলে পড়া এসব করা যাবে না।

৮. বন্ধুবান্ধবের ব্যাপারে নেতিবাচক মন্তব্য করা যাবে না। তবে তারা কী করছে, কাদের সাথে মিশছে সেটা অন্যভাবে সুপারভিশন করতে হবে। না হলে তারা বাবা মার প্রতি বিশ্বাস ও আস্থার জায়গাটা হারিয়ে ফেলবে।

৯. বাবা-মা তার সন্তানকে এ বয়স সম্পর্কে এবং বয়সে শারীরিক পরিবর্তন সম্পর্কে ভয়ভীতি দূর করে ইতিবাচক ধারণা তৈরিতে সাহায্য করবে। খুব সহজ সরলভাবে বাবা-মা তাদের সন্তানদেরকে বুঝাবে যে এ বিষয়টা অস্বাভাবিক কিছু নয় এটা সবার জীবনেই ঘটে এবং ঘটবে। এটা প্রাকৃতিক। তাদের জীবনেও যে এই বিষয়গুলো ঘটে গেছে তা শেয়ার করবে।

১০. বাচ্চাদের কোন বিষয়ে বারংবার নিষেধাজ্ঞা করা যাবে না। কারন নিষেধকৃত বিষয়টির উপর বেশি আগ্রহ জন্মায়।

১১. ১৮ বছরের আগ পর্যন্ত বাচ্চাদের মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, ল্যাপটপ, ভিডিও গেমস ইত্যাদি অনলাইন ডিভাইসের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখবেন। আশা করছি আপনার সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ পরিকল্পায় এ উদ্যোগগুলো গ্রহণ করা খুবই জরুরি। সন্তানদের সাথে বেশি সময় ব্যয় করতে হবে এতে করে ভালোবাসা এবং বিশ্বাসের বন্ধন গড়ে উঠবে এবং তারা ডিজিটাল ডিভাইজ আসক্তি থেকে মুক্ত হবে।

১২. বাংলাদেশে বয়ঃসন্ধিকালে বেশিরভাগ ছেলে মেয়ে অপুষ্টিতে ভোগে। কারণ স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বেশিরভাগ পরিবার সচেতন নয়। তাই এই সময় ছেলে মেয়ে উভয়কে, প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, কার্বোহাইড্রেট, জিংক, আয়োডিন, আয়রনসমৃদ্ধ খাবার যেমন শাকসবজি, ফলমূল, ডাল, ডিম, দুধ, মাছ, মাংস খাওয়ানো খুবই জরুরি।

১৩. বয়ঃসন্ধিকাল এমন একটা সময় যে সময় যখন কিশোর-কিশোরীরা সহজেই অসৎ সঙ্গে জড়িয়ে যেতে পারে। কারণ এ সময় পরিবারের মানুষের চেয়ে অনেকসময় পরিচিত অপরিচিত বন্ধু-বান্ধবকে বেশি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। তাই, এ সময় বাবা-মার ভূমিকা অনেক বেশি। বয়ঃসন্ধির এ সময় বাচ্চারা অনেক সৃজনশীল হয়ে থাকে। তাই তাদের এই ক্ষমতাকে তাদের দক্ষতায় রূপান্তর করতে পারে তার বাবা-মা। তাদেরকে প্রতিদিন বিভিন্ন সৃজনশীল কাজের পাশাপশি, ভালো ভালো বই পড়া, গান শোনা, সিনেমা দেখা, বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এতে মন প্রফুল্ল থাকবে ও মানসিক চাপ প্রশমিত হবে।

শিশু মনোবিজ্ঞানী, সুলতানা রাজিয়া
চেয়ারম্যান, আপন শিশু বিকাশ ফাউন্ডেশন

সাম্প্রতিক ইতিহাসের ভয়াবহ বন্যা

মো: শাহাদাত হোসেন

গত ১১ মে থেকে অব্যাহত ভারী বর্ষণ ও উজান থেকে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে সিলেট জেলায় বন্যা শুরু হয়। জেলার অভ্যন্তর দিয়ে প্রবাহিত সুরমা নদী, সারি নদী, লুভা নদী, ধলাই নদী, কুশিয়ারা নদীর পানি বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিটি পয়েন্টই বিপৎসীমার ওপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়। উজানের পানি নামতে থাকায় নতুন করে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হতে থাকে। ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলের কারণে বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বভাগের অঞ্চলগুলিতে প্রবল বন্যার কারণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও মৃত্যু ঘটে। জুন মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর, চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের ১৭টিরও বেশি জেলায় বন্যার প্রভাব পড়ে। এরমধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয় সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলা। বন্যার প্রভাবে সবমিলিয়ে অর্ধ কোটিরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। বন্যায় কেবল সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় শতকরা যথাক্রমে ৮০ ও ৯০ ভাগ এলাকা পানিতে তলিয়ে যায়। ফলে পানিবন্দি হয়ে পড়ে বিশাল জনপদ। বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ হয়ে যায়, দেশের অনান্য অঞ্চলের সাথে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দেশের ইতিহাসের ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালের বন্যার পরে এটিকে অঞ্চলগুলির সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক বন্যা হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। বেসামরিক প্রশাসন বন্যা পরিস্থিতি সামাল দিতে না পারায় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ড বাহিনী মোতায়েন, সিলেটের আন্তর্জাতিক ওসমানী বিমানবন্দরে উড়োজাহাজ আরোহণ-অবতরণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢল অব্যাহত থাকায় জুন মাসের শেষের দিক পর্যন্ত হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোনা, জামালপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, টাঙ্গাইলসহ আরও বেশ কিছু জেলা বন্যায় আক্রান্ত হয়। ফলে বন্যায় আক্রান্ত এলাকাগুলোতে ক্ষতিগ্রস্থ হয় হাজার হাজার হেক্টর ফসলি জমি, ক্ষেত-খামার, মাছের ঘের, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের তথ্য মতে ১৭ জুন থেকে ২৩ জুন পর্যন্ত বন্যাকবলিত এলাকায় মৃত্যু হয় ৬৮ জনের। বন্যার কারণে বিভিন্ন এলাকায় ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এছাড়া বন্যার্তদের মধ্যে বিভিন্ন পানিবাহিত নানা রোগ দেখা দিয়েছে। তাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে।

বন্যায় দুর্ভোগ বাড়ে কুড়িগ্রামে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েন চরাঞ্চল ও নিম্নাঞ্চলের প্লাবিত হয়ে পড়া ঘর-বাড়ি ও নৌকায় অবস্থান করা মানুষজন। বিশুদ্ধ খাবার পানি ও শুকনো খাবারের সংকটে পড়েন তারা। অনেক পরিবার নৌকায়, ঘরের ভিতর উঁচু করা মাচানে দিন-রাত পার করেন। এখানেই চলে তাদের রান্না-বান্নাসহ দৈনন্দিন কার্যক্রম। গত ২০ জুন তোলা ছবি।

বন্যার কারণ: অতিবৃষ্টির কারণে সৃষ্ট আসাম ও মেঘালয়ের ঢলের পানি ভারতের বরাক নদী হয়ে সিলেট অঞ্চলের সুরমা ও কুশিয়ারা নদীসহ বহুসংখ্যক উপনদী ও হাওর অঞ্চল হয়ে ধনু নদীর মাধ্যমে কিশোরগঞ্জে মেঘনা নদীতে গিয়ে মেশে। হাওরগুলিতে অপরিকল্পিতভাবে সড়ক, স্লুইসগেট ও বাঁধ নির্মাণ, নদীশাসন ও উন্নয়নের নামে নদীর গতিপথ সংকোচন, নদীতে বর্জ্য ফেলা, নদীদখল, উজানে নির্বিচারে পাহাড় ও টিলা কাটার ফলে ভূমিক্ষয়ের কারণে পলি জমা হয়ে বাংলাদেশের নদীসমূহের নাব্যতা হ্রাস, ভারতে উজানে বাঁধ নির্মাণ ও বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত পানি আকস্মিক ছেড়ে দেওয়া, ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বন্যার ঝুঁকি সাম্প্রতিককালে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে হাওড় অঞ্চলটি সমুদ্র সমতল থেকে খুব বেশি উঁচু নয় বলে সহজেই প্লাবিত হয়ে পড়ে।

তবে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা বলেন, যে প্রবল বৃষ্টিপাত বাংলাদেশে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়েছে তার সম্ভাব্য কারণ জলবায়ু পরিবর্তন। দক্ষিণ

এশিয়ার মৌসুমী বৃষ্টিপাত যদিও প্রাকৃতিক বায়ুমণ্ডলীয় প্যাটার্ন অনুসরণ করে, তবে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ক্রমাগত বাড়তে থাকায় এটি আরও অনিশ্চিত ও প্রবল হয়ে উঠছে। (রয়টার্স)

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনও (বাপা) মনে করে তিনটি কারণে বাংলাদেশে এই ভয়াবহ বন্যার দেখা দিয়েছে। প্রথম কারণ হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তনের কথা জানিয়েছে পরিবেশ নিয়ে কাজ করা এ আন্দোলনটি। এটা বৈশ্বিক কারণ। এই বৃষ্টি আরও বাড়বে।

দ্বিতীয় কারণ, ভারতের আওতায় অনেক নদী আছে। মেঘনা অববাহিকায় ১৬টি আন্তদেশীয় নদী আছে। কিন্তু একটির জন্যও পানি-পলি ব্যবস্থাপনা যৌথভাবে করার চুক্তি নেই। ভারত তাদের বাধ ইচ্ছেমতো ব্যবহার করছে। যখন প্রয়োজন পানি ধরে রেখেছে। যখন প্রয়োজন খুলে দিয়েছে। যৌথ ব্যবস্থাপনায় গেলে পরিস্থিতি সামলানো যেত। পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় বেষ্টনী পদ্ধতির ব্যবহার, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, নদী দখল ও ব্যবস্থাপনার অনিয়ম, যত্রতত্র বালু উত্তোলনকে বন্যার তৃতীয় কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে বাপা।

বন্যার্তদের পাশে সারাদেশঃ বন্যায় দেশের ১১টি জেলায় মানবিক সহায়তা হিসেবে সরকারের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে ১৭২০ মেট্রিক টন চাল, দুই কোটি ৭৬ লাখ টাকা নগদ সহায়তা ও ৫৮ হাজার শুকনো ও অন্যান্য খাবারের প্যাকেট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বরাদ্দ দেওয়া জেলাগুলোর মধ্যে- সিলেট জেলায় এক হাজার মেট্রিক টন চাল, এক কোটি ১৩ লাখ টাকা ও ২০ হাজার শুকনো ও অন্যান্য খাবারের প্যাকেট, সুনামগঞ্জ জেলায় ৫২০ মেট্রিক টন চাল, ৯৮ লাখ টাকা ও ১২ হাজার শুকনো ও অন্যান্য খাবারের প্যাকেট, নেত্রকোনা জেলায় একশত মেট্রিক টন চাল, ২০ লাখ টাকা ও ৫ হাজার শুকনো ও অন্যান্য খাবারের প্যাকেট, রংপুর জেলায় তিন হাজার শুকনো ও অন্যান্য খাবারের প্যাকেট, নীলফামারী জেলায় ৫ লাখ টাকা ও ৩ হাজার শুকনো ও অন্যান্য খাবারের প্যাকেট, কুড়িগ্রাম জেলায় ১০ লাখ টাকা ও এক হাজার শুকনো ও অন্যান্য খাবারের প্যাকেট, হবিগঞ্জ জেলায় ১০ লাখ টাকা ও ২ হাজার শুকনো অন্যান্য খাবারের প্যাকেট, মৌলভীবাজার জেলায় একশত মেট্রিক টন চাল, ১০ লাখ টাকা ও ২ হাজার শুকনো অন্যান্য খাবারের প্যাকেট । শেরপুর জেলায় ১০ লাখ টাকা ও ৪ হাজার শুকনো ও অন্যান্য খাবারের প্যাকেট, জামালপুর জেলায় ৪ হাজার শুকনো ও অন্যান্য খাবারের প্যাকেট এবং কিশোরগঞ্জ জেলায় ২ হাজার শুকনো অন্যান্য খাবারের প্যাকেট দেওয়া হয়। এছাড়াও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন, আগামীতে যা যা বরাদ্দ প্রয়োজন তা প্রদানের ঘোষণা দেওয়া হয় সরকারের পক্ষ থেকে।

শুরু থেকেই বন্যা পরিস্থিতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি পর্যবেক্ষণ করেন। সরকারি ও আওয়ামী লীগের দলীয় উদ্যোগে বন্যার্তদের জন্য সরকারের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। দলটির অঙ্গ-সংগঠনের নেতাকর্মীরাও মাঠে রয়েছেন।

কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের একটি আধাপাকা ঘর বন্যার পানির স্রোতে ভেঙ্গে যাওয়ায় ওই কলেজের পাঠদান বন্ধ করা হয়। বন্যার পানি থেকে রক্ষার উদ্যোগ না নিলে সম্পূর্ণ কলেজটি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা করছেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ। গত ২৩ জুন বৃহস্পতিবার তোলা ছবি।

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বন্যা কবলিত এলাকা এবং বন্যার্ত মানুষের দুর্দশা সরেজমিন দেখতে ২১ জুন সিলেটে যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। হেলিকপ্টার থেকে প্রথমে নেত্রকোণা, তারপর সুনামগঞ্জ এবং সবশেষে সিলেটের পরিস্থিতি তিনি দেখেন। বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শন শেষে সিলেট সার্কিট হাউজে গিয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় প্রশাসনকে বন্যা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

দেশে বন্যার্তদের ত্রাণের অর্থ সংগ্রহে জনগণের কাছ থেকে অর্থ সহযোগিতার উদ্যোগ নেয় বিএনপি। ২৩ জুন থেকে রাজধানীর বিভিন্ন ওয়ার্ডে লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে এই কার্যক্রম শুরু করে তারা। এছাড়াও স্থানীয়ভাবে বিএনপি নেতাকর্মীরা ত্রাণ বিতরণ, বন্যার্তদের সহায়তায় কাজ করে।

বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণের স্বার্থে সাত দিনের জন্য ঢাকা, সিলেট ও রংপুর বিভাগে জাতীয় পার্টির সব সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড স্থগিত করে পার্টির চেয়ারম্যান ও সংসদের বিরোধীদলীয় উপনেতা জিএম কাদের এমপি। এক আদেশে জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীদের বন্যা দুর্গতদের পাশে থাকার নির্দেশ প্রদান করেন।

দেশের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছে দেশের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ, অভিনেতা-অভিনেত্রী, স্যোশাল মিডিয়া সেলিব্রিটিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক সংগঠন ও ব্যক্তিরা।

বন্যাদুর্গত বিপর্যস্ত মানুষদের জন্য আর্থিক সহায়তা চেয়ে ফেসবুকে লাইভ করেন তরুণ গায়ক তাশরিফ খান। সেই লাইভ মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়। দেশের মানুষের কাছে অনুদান পান ১৬ লাখ টাকা। তারপর তাঁদের লেনদেনের সীমা শেষ হয়ে যায়। কোনো কূলকিনারা পাচ্ছিল না তাশরিফের দল। পরে গতকাল আবারও মানুষের কাছে সহায়তা চেয়ে ফেসবুক লাইভ করেন এবং মুঠোফোনে আর্থিক লেনদেনের নম্বর দিয়ে দেন। সেই নম্বরগুলোতে গত ২৪ ঘণ্টায় জমা হয়েছে এক কোটি টাকার বেশি।

শেরপুরে অতি বৃষ্টিপাতের ফলে নালিতাবাড়ীতে উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ভোগাই নদীর ঢলে নদীর তীর ভেঙ্গে শহর ও গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। ছবিটি মঙ্গলবার (২১ জুন ২০২২) তোলা।

এছাড়াও বানভাসিদের সহযোগিতার জন্য তিন দিনে দেড় কোটি টাকা সংগ্রহ করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আহ্বানের পর দেশ-বিদেশ থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মাধ্যমে তার কাছে এই অর্থ পাঠিয়েছেন। আরও অনেকে স্যোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে বন্যার্তদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। এছাড়াও ব্যক্তি, রাজনৈতিক, সাংগঠনিক উদ্যোগেও বন্যার্তদের সাহায্য অব্যাহত রয়েছে।

ক্ষয়ক্ষতি: বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে সড়ক, কৃষি ও মাছের।

কমছে বন্যার পানি, তবে এখনো সীমাহীন দুর্ভোগে রয়েছে বন্যকবলিত এলাকার মানুষ। ছবিটি গত মঙ্গলবার (২১ জুন ২০২২) সুনামগঞ্জের সদর এলাকা থেকে।

এছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গবাদিপশু ও গ্রাম, অবকাঠামোরও ব্যাপক ক্ষতি হয়। এছাড়াও নদী ভাঙ্গণের ফলে ফসলি জমি, স্কুল-কলেজ, বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জাতিসংঘের বন্যা পরিস্থিতি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এবারের আকস্মিক বন্যায় সুনামগঞ্জের ৯৪ শতাংশ এবং সিলেটের ৮৪ শতাংশের বেশি জায়গা প্লাবিত হয়েছে। এতে আনুমানিক ৪৩ লাখ মানুষ সরাসরি ক্ষত্রিগ্রস্ত হয়েছে। এদিকে বাংলাদেশ কৃষি মন্ত্রণালয়ের হালনাগাদ তথ্যে বলা হয়েছে, চলমান বন্যায় এখন পর্যন্ত ৫৬ হাজার হেক্টর জমির আউশ ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া বন্যার পানিতে আনুমানিক ১০ হাজার হেক্টর জমির শাকসবজি, তেল বীজ এবং অন্যান্য ফসল প্লাবিত হয়।

অন্যদিকে মৎস্য অধিদপ্তর সূত্র জানায়, চলমান বন্যায় দেশের পাঁচ বিভাগের ১৫টি জেলার ও ৯৩টি উপজেলার ৬৭ হাজার ৬১০টি মৎস্য খামারের মাছ ভেসে গেছে। যার পরিমাণ ১৬ হাজার ৫৮২ মেট্রিক টন। এতে খামারিদের ক্ষতি হয়েছে ১৬০ কোটি ৪২ লাখ টাকা। এছাড়াও অবকাঠামো গত ক্ষতি হয়েছে ৯ কোটি ৯১ লাখ টাকা।

বন্যাদুর্গত এলাকায় মূল্যবৃদ্ধি: বন্যার ভয়াবহতা শুরুর পর সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ ও গোয়াইনঘাট উপজেলার বন্যাকবলিত মানুষের স্বজনেরা ভিড় করতে থাকেন সিলেট শহরের পার্শ্ববর্তী গোয়াইনঘাট উপজেলার সালুটিকর ঘাটে। সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এই ঘাটে শতাধিক যাত্রীবাহী নৌকা ছাড়াও বালুবাহী নৌকাও বন্যাদুর্গতদের সরিয়ে আনার জন্য কাজ করে। কিন্তু নৌকার মালিক ও মাঝিরা সব নৌকার ভাড়া অন্তত শতগুণ বাড়িয়ে দেয়। সালুটিকর

থেকে কোম্পানীগঞ্জের তেলিখাল গ্রামের দূরত্ব ১০ কিলোমিটার। স্বাভাবিক সময়ে এই পথটুকু নৌকায় যেতে ৮শ' থেকে ১ হাজার টাকা খরচ হয়। বন্যার সময় এই ১০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে মাঝিরা ভাড়া হাঁকেন ৫০ হাজার টাকা। অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে গ্রামের বাড়ি থেকে সিলেট শহরে নিয়ে আসতে গিয়ে এমন অমানবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হন মারুফ আহমেদ নামে এক ব্যক্তি। তিনি ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে রাজি হলেও নৌকার মাঝি রাজি হননি। বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যমে খবর প্রকাশ হলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় ওঠে।

এছাড়াও বন্যাদুর্গত এলাকাগুলেঅতে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীরা খাদ্য সামগ্রীর কৃত্রিম সংকট তৈরির খবর পাওয়া যায়। বন্যার্তদের অসহায়ত্বের সুযোগে বন্যাক্রান্ত মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দিগুণ মূল্য হাতিয়ে নেন ব্যবসায়ীরা। ফলে পানিবন্দি মানুষের দূর্ভোগ আরো বৃদ্ধি পায়। ২৫ টাকা দামের মোমবাতি ৮০ থেকে ১শ টাকা প্যাকেট বিক্রি, চিড়া ৯০ টাকা কেজি, মুড়ি ১শ-১১০টাকা, কেরোসিন ১শ থেকে ১৩০টাকা, দিয়াশলাই ডজন ৩০ টাকা বিক্রির মতো ঘটনাও ঘটে। ৫০ কেজির চালের বস্তার দামও ২০০ থেকে ৩০০ টাকা করে বেশি নেওয়া শুরু হয়। এছাড়াও গ্যাস সিলিন্ডার, পেঁয়াজ, আলুসহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রীর দামও বৃদ্ধি করে অসাধু ব্যবসায়ীরা।

মৃত্যুঃ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের তথ্য মতে ১৭ জুন থেকে ২৬ জুন পর্যন্ত বন্যাকবলিত এলাকায় মৃত্যু হয়েছে ৮৪ জনের। বন্যায় সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে সিলেট বিভাগে। এই বিভাগে এ পর্যন্ত ৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে। সিলেট বিভাগের চার জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে সুনামগঞ্জ জেলায়। এই জেলায় এখন পর্যন্ত ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এরপর বেশি মৃত্যু হয়েছে সিলেট জেলায়। জেলাটিতে ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিভাগের হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলায় মারা গেছে যথাক্রমে ৪ ও ৪ জন।

লাগাতার বৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলের কারণে সিলেটের বিভিন্ন উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়। সুরমা নদীর পানি বিপদ সীমার উপরে থাকায় পানি প্রবেশ করে নগরীতে। ছবিটি বৃহস্পতিবার (১৬ জুন ২০২২) সিলেট নগরীর তালতলা থেকে তোলা।

সিলেট বিভাগের পর বন্যায় বেশি মৃত্যু হয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগে। এই বিভাগে মারা গেছে ২৮ জন। এই বিভাগের ময়মনসিংহে ৫, নেত্রকোনায় ৯, জামালপুরে ৯ ও শেরপুরে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও রংপুর বিভাগে এখন পর্যন্ত বন্যায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে কুড়িগ্রামে ৩ ও লালমনিরহাটে একজন মারা গেছেন।

বন্যা উপদ্রুত এলাকায় বেশি মৃত্যু ঘটে পানিতে ডুবে। এ পর্যন্ত ৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছে পানিতে ডুবে। আর বজ্রপাতে মারা গেছে ১৪ জন।

ধর্মব্যবসার ফাঁদে

ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্মব্যবসা কী?
ধর্মব্যবসায়ী কারা ও এর কুফল?
ধর্মব্যবসা জাতির কী ক্ষতি করছে?
ধর্মব্যবসা থেকে মুক্তির উপায় কি?

এধরনের নানা প্রশ্নের জবাব জানতে
সংগ্রহ করুন বইটি।

01670174643
01711005025